আগামী কাল

আগামী কাল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

আগামী কাল

অক্টোপাসের মত সহর তার নুলো বাড়িয়েছে চারি ধারে—

শ্যামল মৃত্তিকা থেকে শুষে নেয়—সমস্ত শাঁস ও শস্য—তাজা মানুষের রক্ত ও প্রাণ—আত্মাও।

কিন্তু শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয় এদিকটা যেন অন্য রকম দেখায়। মনে হয় ও যেন রাস্তা নয়; ও যেন অন্ধ শ্রান্ত কাতর কোন অবরুদ্ধ প্রাণের ব্যাকুল সব বাহু অনিশ্চিত সুদূরের দিকে প্রসারিত হ'য়ে আছে।

হয়ত এও তার আর একটা রূপ!

কে জানে!

দিনের বেলায় ইঞ্জিনিয়ারের গজ ফিতে, রোলার, কণ্ট্রাক্টা-রের হিসেব আর কুলির গাঁইতি, আর রাত্রে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয় তার পঙ্গু আত্মার এই কাকুতি।

হয় ত দুইই সত্য।

আগামী কাল

সহর সাবালক হচ্ছে। কার গেল ফলের বাগান, কার গেল ফসলের ক্ষেত, গোল পাতার গাঁ উঠ্‌ল—পুকুর দীঘি ভরাট হ'ল, তাল নারকেল খেঁজুরের মাথা নুইল—সহর এগিয়ে চলেছে।

সমস্ত সমতল করে খোয়া মাড়িয়ে বড় বড় নতুন সড়ক চলেছে মাটিকে ভাগ ক'রে ক'রে।

সহরের বড় বড় ব্যবসাগুলি বুঝি ফেঁপে উঠেছে। দু'শ নতুন চিমনি উঠেছে আকাশের মুখে কালি মাখাতে। খাজাঞ্চিখানার কেরাণীদের আর কলমের কামাই নেই; বড় নদীটার জেঠিতে জেঠিতে জাহাজে জাহাজে জাঁতাজাঁতি···

—ধান আর পাট বুঝি, গালা আর তুলো, চামড়া···বাজার এমন চড়া কেউ দেখেনি কখন। বানের নদীর মত সহর সব সীমা ভেঙ্গে বেড়ে চলেছে।—ধরণীর গায়ে দূষিত বিস্ফোটকের মত কি?

রাত্রে কিন্তু এদিকের অর্দ্ধসমাপ্ত পথগুলি যেন মনে হয় রূপকথার দেশের পথিক।

বসতিবিরল বিস্তীর্ণ প্রান্তর আপনার বিপুল নিস্তব্ধতায় থম্‌থম্ করে। পথ আগলে রক্তচক্ষু বাতিগুলি পাহারা দেয়, অসম্পূর্ণ রাস্তার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের পোষ্টগুলি সৈন্যশ্রেণীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

মনে হয় মানুষের দম্ভ যেন মানুষের স্বপ্নের সাথে সন্ধি করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে!

লোকটার সমস্ত মুখ দিয়ে যেন খোসা উঠছে,—শুকনো, ফাটা, নীরস। রুক্ষ চুলগুলো মাথার উপর ঝাঁকড়া হ'য়ে আছে, ময়লা, নোংরা কাপড়টা মালকোচা মেরে পরা, তার ওপর খাকি রঙের ছেঁড়া দাগী কোটটা গায়ে ঢল্ ঢল্ করে।

অদ্ভুত কায়দায় দুটো টিনের পাত হাতে কাঁচির মত বাগিয়ে ধরে পান কাট্‌তে কাট্‌তে শিবু বলে, "এখন বিঘের দরে কাঠা বিকোয়, রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত বাড়ী গজাচ্ছে, সেদিন আর আছে..."

ঠোঁটের এক কোণে বিড়িটা চেপে ধরে, হাতের চেটোর আড়ালে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে লোকটা ঠোঁটের অন্য কোণে বলে, "হুঁ!"

চূণ খয়েরের কাঠিটা বুলিয়ে সুপুরি এলাচ মশলা দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে শিবু পান মোড়ে।

"তিন বছর আগেও এই কলাবাগানে দিন দুপুরে ডাকাতি হয়ে গেছে।"

শুকনো লোকটা এক সঙ্গে সব কটা পান মুখে পুরে দেয়; ডান গালের খোদলটা ঢিপির মত উঁচু হয়ে ওঠে। পকেট থেকে আধময়লা একটা রুমাল বার করে মাথায় বেঁধে বলে, "যা—রদ্দুর!"

শিবু কথা কয় না, বিজ্ঞের মত একটু হাসে।

লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, "এই সোজা গিয়েই বিপিনবাবুর বাড়ী পাব ত?"

"হ্যাঁ।"

খোসা ওঠা লোকটা শান্তভাবে পা টেনে টেনে চলে যায়।

রাস্তার দুটো ফ্যাকড়া চিম্‌টের ফলার মত দুধারে বেরিয়ে গেছে। তারি মোড়ে কেরোসিন কাঠের ছোট পানের দোকানটি—সহরের অগ্রদূত।

সামনে রঙিন জলভরা দুটি কাঁচের বোতল ঝোলে। ভেতরে গা-ময় হরেকরকমের ছবি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন, দেশলাইর ট্রেডমার্ক থেকে কাপড়ের ছবি পর্য্যন্ত।

বিড়ি আছে, সস্তা সিগারেট, দেশলাই, মোমবাতি, মায় কাশীর জরদা।

আগামী কাল

ইটের দেয়াল আর করগেটের চাল—ছোট্ট বাড়ীটি। সামনে বাঁ্যাকারির বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটু বাগান।

খোসা ওঠা লোকটা গিয়ে ডাকে, "বিপিনবাবু—"

স্বয়ং বিপিনবাবুই বোধ হয় খিল খুলে বাইরে বার হন। ছোট্ট আঁটালো গোলগাল মানুষটি, টাকপড়া মাথাটি বেলের মত চাঁছাছোলা, পরিষ্কার। পরনের ছ'হাতি ধুতিটি হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগোয় নি। কপালে হাত ঢাকা দিয়ে রোদ বাঁচিয়ে ছোট ছোট চোখ দুটি মিট্ মিট্ করে বলেন, "কে ?"

"আমি বিলাস !"

ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় বিপিনবাবুর মুখের ওপর দিয়ে একটি ছায়া সরে যায়, বলেন, "এসো।"

বিলাস গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করা অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরটিতে ঢোকে।

"বোস।"

বিলাস ঘরজোড়া তক্তপোষটির একপাশে বসে। তক্তপোষের একমাথায় বিছানাটি গুটিয়ে রাখা। বিছানায় হেলান দিয়ে আলবোলার নলটি তুলে নিয়ে বিপিনবাবু বলেন, "তারপর— !"

তারপর চুপচাপ। কেউ কথা পাড়ে না। ব্যাপারটা কি ?

বিপিনবাবু হুবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলেন, "তারপর—"

তবু কেউ কথা কয় না। দরজার একটা ছিদ্র দিয়ে সড়কির মত সরু একটি রোদের রেখা এসে ঘরে পড়েছে। তামাকের ধোঁয়া সেই রেখাটি জুড়ে নীল হয়ে গুলোয়।

হঠাৎ বিলাস ঘু'রে বসে বলে, "তারপর ?—তারপর এত ঘাবড়াচ্ছ কেন ?"

"কে—আমি ? বাঃ—বাঃ আমি ঘাবড়াব কেন ?—বিপিন-বাবু একেবারে উঠে বসেন।

বিলাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসে মাত্র। চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে বলে, "বেশ গুছিয়ে বসেছ দেখ্‌ছি যে !"

অপর পক্ষকে নিরুত্তর দেখে খানিক বাদে আবার বলে, "ভোলও দিব্যি ফিরিয়েছ ! টাকটি বাগালে কোথায় ?"

আলবোলার নলটা নামিয়ে রেখে বিপিনবাবু বলেন, "আমি তোমার কথার মানে কিছু বুঝতে পারছি না বিলাস !"

বাঁ চোখের ভুরুটা কপালে তুলে ঠোঁটের হুধার একটু কুঁচ্‌কে বিপিন বলে, "তার আর আশ্চর্য্য কি ! অনেক দিন বাদে পুরাতন সখাকে দেখে আনন্দে একটু গদগদ হয়ে পড়েছ আর কি !"

"না, ঠাট্টা নয়।"

"ঠাট্টা! ঠাট্টা কে কর্‌ছে! বন্ধুকে দেখে বন্ধু আহ্লাদে আটখানা হবে—এটা ঠাট্টার কথা নাকি ?"

বিপিনবাবু জোরে জোরে হাসেন। "একেবারে ঠিক সেই রকমটি আছ বিলাস!"

"হ্যাঁ দাদা, বদলাবার ফুরসুত পাই নি! এখনও পেটের ধান্দায় দিনরাত ঘুরতে হয়। কিন্তু দাদা, তুমি বদলেছ! ক'বছরের মধ্যে মাথাটিকে দিব্যি মোলায়েম মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছ, পৈতৃক নামটাও পাল্টেছ। দেহে কিঞ্চিৎ মাংস ও মেদেরও সঞ্চার হয়েছে। তারপর কলাবাগানের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বিপিনবাবু কি রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার, না—পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া বিতাড়িত জমিদার ?"

বিপিনবাবু মুখ চোখ লাল করে বলেন, "দেখ বিলাস, আমারই বাড়ীতে বসে আমায় অপমান কর্‌তে তোমায় আমি দেব না।"

"রামঃ—তা কখন কেউ দেয়—! কিন্তু বুঝতেই ত পারছ দাদা, বাজার মন্দা, খবরের কাগজ ফিরি করে দিন গুজরান হয়; তোমার আজকাল সময় ভাল, ভাবলাম একটি বড় খদ্দের হলেও হতে পার!"

বিপিনবাবু বোধ হয় কথাটা ভাল করে বোঝেন না, নির্ব্বোধের মত সামনের দিকে চেয়ে থাকেন। বিলাস জামার

বিশাল গহ্বরের মত পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে সসম্মানে তার হাতে দেয়।

পুরাণ খবরের কাগজ। অনেকবার মুড়ে মুড়ে বোঝা যায় ভাঁজগুলো ছিঁড়ে পড়বার মত হয়েছে।

বিপিনবাবু খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে খানিকটা বিমূঢ় হয়েই থাকেন। তারপর হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে, খানিকটা লেখা লাল কালির দাগে ঘেরা।

বিলাস পানে ছোবান দাঁত বার করে ঈষৎ হাসে।

বিপিনবাবু পড়েন।

পড়া শেষ হতে না হতে বিলাস হঠাৎ কাগজটা টেনে নেয় হাত থেকে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, "কাগজের দামটা আগে ফেলে দিলে ভাল হত না কি ?"

বিপিনবাবু ক্ষিপ্তের মত লাফিয়ে ওঠেন, "অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু বিলাস !"

কিন্তু বিলাস তক্তপোষ থেকে নেমে, কাগজটি ডান হাতে পেছনে লুকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"মাফ্ করতে হবে দাদা ! দামটা না পেয়ে কাগজটা কেমন করে দিই ?"

বিপিনবাবু রুদ্ধ ক্রোধে উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই বলেন, "দাম আমি দেবো।"

"বহুৎ আচ্ছা!"—বিলাস কাগজখানা এগিয়ে দেয়।

বিপিনবাবু পড়া শেষ করে বিলাসের দিকে চেয়ে এবার হাসেন, "তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও বিলাস?"

বিলাস কথার উত্তর দেয় না, গম্ভীর স্বরে বলে, "কাগজের দামটা?"

রাগে তক্তপোষে সজোরে চাপড় মেরে বিপিনবাবু বলেন, "তোমার থিয়েটারী ঢং রাখো, তোমার কাগজের দামের চার পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি!"

"দশ হাজারের একটি আধলা কম নয়।"

এবার বিপিনবাবু হো হো করে হাসেন, "তুমি সত্যি পাগল হয়েছ বিলাস!"

বিলাস তেমনি থিয়েটারী ঢঙে কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে যায়, "শুধু দশ হাজার নয়! তোমার বাড়ীতে দুটি বছরের দানাপানি আর আস্তানা।"

"একটি কাণা কড়িও তাহলে নয়! ভয় আমার একলার নয় বিলাস, সেটা তুমি বোধ হয় সহজে ভুলে যাচ্ছ! ডুবতে হলে তোমায় না জড়িয়ে আমি ডুবব না।"

বিলাস তেমনি সহজ কণ্ঠে বলে যায়, "ভয় আমারো আছে বই কি দাদা। ন্যাংটার যেমন বাটপাড়ের ভয়! দশবছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছি তোমার খোঁজে, বড়লোকের

গাড়ী-বারান্দায় শুয়ে আর চানা চিবিয়ে দিন কাট্‌ছে ; ভয় আমার নয় ?"

ভিতর দিকের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা যায়। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে বলে, "বাবা, তোমার কলকে বদলে দেব ?"

সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে অত্যন্ত ক্রূর মুখভঙ্গী করে বিলাস বলে, "ভয় দুজনেরই, কেমন বিপিন ? কিন্তু আমি ডুবলে—"

বিলাস আর কিছু বলে না। খোসা ওঠা মুখটা নির্ম্মম হাস্যে অত্যন্ত বীভৎস দেখায়।

সহর বাড়ে।

কেন?

আমেরিকার উপর দিয়ে বুঝি আগুনের হল্কা গেছে। কানাডা থেকে সারা আমেরিকায় অজন্মা।

মধ্যোপসাগরের পশ্চিম দরজায় ইউরোপের ক'টা মাথা বুঝি ঠোকাঠুকি করে মরছে। কোন্ বৈজ্ঞানিকের তপস্যায় বুঝি কাঁচ তার ভঙ্গুরত্ব ত্যাগ করেও খোলামকুচির মত সস্তা হয়েছে। তাই সহরের চিমনিগুলো আকাশের দিকে ফণা তুলে উঠ্ছে, তাই তার এই বাড়্।

হ্যারিকেনের কাঁচের চিমনির ভেতরেও আলোর শিখাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, চিমনিতে শিষ উঠে কালি পড়ে।

দক্ষিণের হাওয়ার ত আর আটক নেই। বাধাহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়।

"জানলাটা বন্ধ করে দেব বাবা? এত হাওয়া, নইলে বাতিতে শিষ উঠবে আরো।"

বিলাস গলার স্বর মিষ্ট করে বলে, "দাও ত মা!"

লীলা ভ্রূকুটি করে একটু। জানলাটা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিলাস বলে, "আমাকে বিশ্বাস করতে তোমায় বলি না, কিন্তু আমার বুদ্ধিতে বিশ্বাস রেখে কখনো ঠকেছ?"

"না, আমার সাহস হয় না।"—বিপিনবাবু হাতের ওপর মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিলাস হঠাৎ উঠে দক্ষিণের জানলাটা আবার খুলে দেয়। কাঁচের চিমনির ভেতর আলোর শিখা হাওয়ার দমকে অকস্মাৎ যেন চমকে লাফিয়ে ওঠে।

"আবার খুললে কেন?"

সামনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বিলাস বলে, "দক্ষিণের এই মাঠটা কার, জান?"

"পালেদের।"

"এই সমস্ত মাঠটা কিনতে হবে।"

বিপিনবাবু হেসে বলেন, "একশ বিঘে পোড়ো জমি ইটখোলা

করতে গিয়ে লোকসান দিয়ে পালেরা ফেলে রেখেছে—একটা পয়সা হয় না ওথেকে। তুমি ক্ষেপেছ!”

“আবার ইটখোলা হবে,—তা ছাড়া আরো কাজ আছে।”

“তোমার মাথা আছে! অন্ততঃ পঁচিশ হাজারের কমে তারা ছাড়বে না—আমার অত টাকা নেই, আর থাকলেও আমি পাগল হই নি।”

“আমার দশ হাজার আর তুমি ত্রিশ হাজার দাও—বারো আনা চার আনা বখরা ; মনে রেখো আমার মাথাটা ফাউ।”

বিপিনবাবু রেগে ওঠেন, “চুলোয় যাক তোমার মাথা। আমার কাছ থেকে আর একটি কাণাকড়ি তুমি বার কর্‌তে পারবে না। গলায় ছুরি দিলেও নয়।”

“কিন্তু টাকা যে চাই-ই আমার।”

বিপিনবাবু উত্তেজনায় উঠে বসে বলেন, “তুমি কি এখনো এমনি করে জুলুম করবে বিলাস! তোমার কথামত সমস্তই হ’ল, তবু কি তুমি আমায় পথে বসাতে চাও—একটু মায়া দয়া নেই তোমার!”

“দশ বছর আগে আমায় পথে বসিয়ে সরে পড়বার সময় কতখানি মায়া দেখিয়েছিলে ভাই?···কিন্তু সে কথা নয়; এতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।”

"আর মন্দ হ'লে লীলার কথাটা একবার ভেবে দেখেছ?"

"দেখেছি, আর পরের মেয়ের জন্য এত দরদই বা কিসের।" —বিলাস একটু মুচকে হাসে।

বিপিনবাবু কথা কন্ না। চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত শুধু একটু জ্বলে।

বিলাস আবার বলে, "তাহলে এই কথা রইল?"

"না। তুমি যা খুশী করতে পার এবার।"

বিলাস হঠাৎ গিয়ে বিপিনের হাত ধরে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলে, "আহাম্মুক! আমি বেঁক্‌লে তোমার অবস্থাটা তুমি ভেবে দেখেছ একবার! তুমি জেলে পচবে, সে সামান্য কথা, কিন্তু তোমার ওই সাধের মেয়েকে সংসারে কোন আশ্রয় না পেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে শেষ পর্য্যন্ত তা বুঝেছ?"

"তাই ভেবেই তোমার মত বদমায়েসকে দশ হাজার টাকা ঘুস দিয়েছি—কিন্তু তোমার জুলুম আমি সইব না।"

"জুলুম নয় বিপিন, জুলুম নয়"—অত্যন্ত আন্তরিক একটা মিনতির সুর যেন বিলাসের কণ্ঠে বাজে।—"তুমি কি সত্যি সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছ না। সহরে যে মানুষের দাঁড়াবার জায়গা নেই। দু'শ নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে, দু'শ আফিস তার সঙ্গে। এত মানুষের জায়গা চাই ত! রাতারাতি যে জমির দর আগুন হয়ে উঠ্‌ছে তা বুঝতে পারছ! কে জোগাবে

এ সব জমির মোকামের মশলা। কে এই সহরকে টেনে আনবার ভার নেবে? আমি বলছি, আমায় বিশ্বাস কর বিপিন, তোমার লোকসান হবে না।"

"টাকা ত মাত্র চল্লিশ হাজার! তুমি ত দুনিয়া মাত করছ।"

নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় কণ্ঠস্বর নামিয়ে বিলাস বলে, "ওই চল্লিশ হাজারের বিষয় বন্ধক দিয়ে টেনে টেনে আমি অন্ততঃ লাখের জমি কিনব।"

"কি রকম?"

"মুখ্খু, চল্লিশ হাজারের জমি বন্ধক দিয়ে ত্রিশ হাজার পাওয়া যায় কিনা আর সেই ত্রিশে জমি কিনে তার থেকে বন্ধকে বিশ পাওয়া যায় ত···"

বিপিনবাবু বলেন, "হুঁ, কিন্তু আমার সাহস হয় না।"

ভেতর থেকে লীলা ডাকে, "তোমাদের খাবার জায়গা হয়েছে বাবা!"

খোসা ওঠা মুখটার কঠিন রেখাগুলোও কেমন করে যেন সে ডাকে কোমল হয়ে আসে।

পাতার কুঁড়েটিও আছে আর তার সঙ্গে তেঁতুল গাছটিও।

সবাই জমি জায়গা ছেড়েছে দাঁও পেয়ে, বাকী কেবল শিবু। শিবু বলে, "ছাড়ব কেন! আমরা কি সহুরে হতে পারি না? আর সহরে সবই ত কোঠা, এখন একটা মেটে ঘর নইলে মানাবে কেন?"

তার তেঁতুল গাছটার কোল দিয়ে নতুন রাস্তাটা একেবারে ঘরের দেয়াল ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিবু ডাকে, "ও হরি, একটু কামিয়ে দিয়ে যাও দাদা।"

বুড়ো হরি নাপিত অত্যন্ত খুশী হয়ে গিয়ে তেঁতুল গাছের মোটা শিকড়টায় ভর দিয়ে বসে। কালো তেলাকুচোর মত মোলায়েম দেহটির মাথায় পাকা সাদা চুলের ছাউনি। মুখে বয়সের একটি রেখাও নেই।

বগলদাবা থেকে নোংরা যন্ত্রপাতির পুঁটলিটি নামিয়ে কাপড়ের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলে, "বাক্স টাক্স নেই বাপু—ওসব বাক্স ফাক্সের ধার ধারি না। বাক্স চাও ত ওই ফক্রের কাছে

কামিও। ওই যে তোমাদের বড় নাপতে হয়েছে গো আজকাল, বাবু ভেইয়ার যার হাতে চুল না কাটলে মাথা কুটকুটোয়। ওই যে ফক্‌রে থেকে যিনি ফকিরচাঁদ হয়েছেন গো।”

“ফক্‌রে আবার কামাতে শিখ্‌লে কবে ?”

ততক্ষণে কামারবাড়ীর সেকেলে, পাথরে-শানান ক্ষুরটি বেরিয়েছে এবং শিশি থেকে পেতলের ছোট বাটীতে খানিকটা জলও ঢালা হয়েছে।

দাড়িতে জল বুলোতে বুলোতে খুশীতে একগাল হেসে হরি বলে, “বল না ভাই, এই কথা বোঝে কে ? সেদিনের ছোঁড়া ফক্‌রে আজ কিনা বাবু সেজে বাক্স হাতে হলেন ফকিরচাঁদ। আবার কেরদানি কত ? ‘জল দিয়ে আবার দাড়ি কামান যায়।’ তোর চৌদ্দ পুরুষ যে জল দিয়ে কামিয়েছে রে হতভাগা। আজ গরু শূয়রের চর্ব্বি দেওয়া বিলেতি সাবানগুলো না মুখে ঘসলে উনি ক্ষুর চালাতে পারেন না।”

ক্ষুরটা হাতের চেটোয় দুবার শানিয়ে বাঁ-হাতে শিবুর জুলপিটা টেনে ধরে হরি একবার টানে; তারপর ক্ষুরটা আবার হাতের চেটোয় শানাতে শানাতে বলে “কেমন। টের পেলে একটু ?”

ভুরু কুঁচকে অবাক হবার ভান করে শিবু বলে, “কই না।”

"আর সেদিন ব্রজবাবু—ওই যে গো নন্দ বাবুদের বাড়ীর নীচে মুদিখানা খুলেছে, বল্লে কি, 'না না, ও সেকেলে ক্ষুরে কামিয়ে কি গালের চামড়াটা খোয়াব!' শোনো কথা! আমিও বলে এলাম, 'তবে ওই ফকিরের বিলিতি শান ক্ষুরেই কামিও। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আর বাপপিতম'র যন্তর বদ্‌লে বিলিতি ক্ষুর কিনতে পারব না।"

"তা ত বটেই।"

"আমাদের দেশে আর কেউ ত কখন কামায় নি! ভাগ্যে বিলেত থেকে ক্ষুর এসেছিল! ওরে বাবা, তাতে শান কি—ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা হয়ে যাবে—টেরটিও পাবে না।"

ফোকলা মুখে হরি হো হো করে হাসে, শিবুও হাসে। এক-গাল ছেড়ে আর এক গাল ধ'রে হরি বলে, "তারপর তুমি পানের দোকান তুল্লে কেন শিবু? চল্ল না?"

"চল্ল না! কিছু না হোক মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা।"

"তবে যে ছাড়লে বড়!"

শিবু বিজ্ঞের হাসি হাসে একটু, বলে, "ওইত!" একটু হেসে আবার বলে, "শুক্‌নিকে জান ত?"

হরি হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে। দাড়ি কামান থামিয়ে চুপি চুপি বলে, "লোকটা কে ভাই—বিপিনবাবুর কেউ

হয় বলেও ত বোধ হয় না। লাট লাট জমি কিনছে, বাজার বসাচ্ছে, ইটখোলা করছে, ব্যাপার কি ?”

সবজান্তার মত গম্ভীর ভাবে শিবু আর একবার হাসে। বলে, “আমার সঙ্গে পের্‌থম দিন আলাপ, একেবারে পের্‌থম দিন। আমিই সঙ্গে ক’রে ত দিয়ে এলাম বিপিনবাবুর বাড়ী। জাগাজমি কেনার মতলব ত বলতে গেলে আমিই দিলাম।”

রুদ্ধনিশ্বাসে হরি বলে, “তারপর ?”

মুখের কাছে মুখ এনে শিবু বলে, “শুক্‌নির বাজার বস্‌ছে না ? কাউকে যেন বোলো না আবার, ও বাজারের আদায়-পত্তর আমিই করব। শুক্‌নি নিজে এসে অনেক করে ধরলে, কি বল কাজটা মন্দ ?”

“না মন্দ কি।” বলে হরি আবার ক্ষুর চালায়—

সাধু ময়রা আড্ডাবাজ রগুড়ে লোক। ছোট খাট পাতলা একহারা মানুষটি, বয়সটিকে কেমন করে যেন ফাঁকি দিয়েছে। গোঁফ দাড়ি কামান পাতলা মুখটা পাখীর ঠোঁটের মত ছুঁচোলো আর তেমনি তার বচন।

যত আড্ডা তাই তার ঘরে।

সাধু বলে, "ময়রার-পো ভাই, রসমুণ্ডি একটা প্রাণ ধরে হাতে তুলে দিতে পারব না, তা ছাড়া যা কিছু চাও।"

অর্থাৎ সেখানে নেশা ভাঙ বড় একটা বাদ পড়ে না।

সাধু আরো বলে, "তিন কুলে কেউ নেই, একদিন যেন কলকের সঙ্গেই কলজে ফাটে।"

রাত দশটায় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়। তারপর আড্ডা জমে। বিহারী আসে, বিশু আসে, ভৈরব বেরা দোজপক্ষের বৌ ফেলেও আসে মাঝে মাঝে, এমন কি নন্দ মুদিও পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে চীনে বাড়ির বুট মশ্‌মশিয়ে এসে বসে, ভাঙ্গা তক্তপোষটার এক ধারে। উটকো লোকেরও বারণ নেই। তাস চলে, পাশা চলে, সাধু সুর করে দাশুরায়ের পাঁচালী আর বিদ্যাসুন্দর পড়ে মাঝে মাঝে। গান গল্প ত আছেই।

কিন্তু তবু সেদিন আড্ডা আর জমতে চায় না।

বিশু কলকেটা নামিয়ে রেখে বল্লে, "না সাধু-দা, তোমার কুমোর বেটা সুনিচ্‌চিং বাসি কাপড়ে এ কলকের চাকী ঘুরিয়েছিল। নইলে একটু জমল না!"

ন্যাকড়াটা কলকেতে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সাধু বল্লে, "না গো সুনিচ্‌চিং ঠাকুর, গোড়ায় চটাচটি করে সব মজাটি তোমরা ছুটিতে আজ খেচ্‌ড়েছ।"

হাড়গিলের মত গলাটা বাড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে বিশু বল্লে, "চটামটি আমি করলাম! আমি? পেরারস্তে ও আমায় বল্লে কি না চোর! বল না দেখি তোমরা! বল্লে কি না?"

বিহারীর চোখ দুটো বুঝি একটু বুজে আসছিল। চট্ করে সজাগ হয়ে চোখ দুটো আরও বড় করে বল্লে, "চোরই ত! যেমন জামা তেমনি ফিরিয়ে দিলাম, বল্লে কি না—'জামা লাট্ হয়ে গেছে, ফিরে নেব না।' ভারী দুটো নিলেমি ছেঁড়া কাপড় নিয়ে দোকানী হয়ে বসেছেন!"

"তা না ত কি! তুইও হ' না দেখি!"

সাধুকে থামাতেই হয়, "ফের সেই ছেঁড়া ঝগড়া!"

বিশু সাধুর হাঁটুটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "তুমি ত ব্যবসাদার! বল না দাদা, দোকান করেছি বলে ত দানছত্তর খুলে বসি নি। নতুন জামাটা নিয়ে গিয়ে সাতদিন বাদে উনি ময়লা করে লাট্ করে ফেরৎ দিতে এলেন। সে জামা নিলে আর বিক্রী হয়! তা ছাড়া ও কলের ছাপা কাপড়ের জামা, ওর পালিশ গেলে আর বেচবো কি!"

"আর হয়েছে ত, থাক্ না।" সাধু কলকেটা ভৈরবের দিকে বাড়িয়ে দিলে। অনেকক্ষণ ধরেই ভৈরব উস্‌খুস্ করছিল, বল্লে, "না ভাই উঠি।"

ভৈরব উঠে বেরিয়ে গেল কিন্তু খানিক পরেই আবার গুড়িসুড়ি মেরে এসে ঢুকে আলগোছে তক্তপোষের একধারে বসে পড়ল।

"ওকি, ফিরে এলে যে!"

ভৈরবের মুখে আর কথা নেই। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ভৈরব অনেক পরে বল্লে, "চ' না বিশু, তোরও ত ওঠ্‌বার সময় হ'ল। এক সঙ্গেই যাব।"

আবার সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

বিহারী হঠাৎ বলেই ফেল্লে কিন্তু চুপি চুপি,—"শুক্‌নি বুঝি?"

ভৈরব চুপি চুপি বল্লে, "হ্যাঁ মাইরী, অন্ধকারে রাস্তার মাঝে ওটাকে দেখলে আমার গা হিম হয়ে যায়! ওটা মানুষ নয় ভাই।"

বিশু অনেকগুলো ঢোক গিলেছে এর মধ্যে, কণ্ঠিটা তার আপনা থেকেই ওঠে নামে। বল্লে, "ভূত প্রেত না হলে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় চরে বেড়ায়!"

সাধু বল্লে, "আচ্ছা সত্যি সারারাত ও রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে কেন?"

কারুর মুখে আর কোন কথা নেই।

ভৈরব শেষে বল্লে, "তোমার লণ্ঠনটা আজকের মত দাও সাধু-দা, কাল সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

সত্যি নতুন সহরের রাস্তায় রাস্তায় সারারাত কে ক্লান্ত চরণ টেনে টেনে ঘুরে বেড়ায়।

লোকে সভয়ে বলে—ও শুকনি!

হয় ত ও সহরের শ্রান্ত কাতর অবরুদ্ধ আত্মা?

দুপুরের রোদে সমস্ত ধূধূ করে।

বাদামতলার মোড় থেকে দেখা যায় দক্ষিণে বাঁজা মাঠ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে—বিশাল তপ্ত তাওয়ার মত, তা থেকে আগুনের হল্কা ওঠে।

শুধু দূরে দেখা যায় একটি নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী দগ্ধ তাম্র মাটি হতে উঠছে, বুঝি শুক্‌নির ইটখোলার পাঁজা থেকেই।

ও যেন ক্লান্ত অবসন্ন পৃথিবীর দিবাস্বপ্ন।

যে পাকা শড়কটা বাদামতলার মোড় থেকে বল্লমের মত সোজা গিয়ে আকাশের ঝালরে বিঁধেছে তারই উপর দিয়ে শুক্‌নির টালি-খোলা থেকে ধূলির পুচ্ছ উড়িয়ে মোটর লরি আসে উর্দ্ধশ্বাসে; 'মেসোজোইক' যুগের যেন কোন্ অতিকায় হিংস্র সরীসৃপ যুগযুগান্তরের নিদ্রা হতে হঠাৎ জেগে উঠেছে।

হঠাৎ চীৎকার ওঠে, হা-হা—গেল—গেল!

পথের শুক্‌নো ধূলোয় আর রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়।

সজীব দেহটা এক পলকে অসাড় মাংসপিণ্ডের মত হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে থাকে।

মোটর লরিটা হঠাৎ বেগ সংবরণ করে রুদ্ধ রোষে যেন গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে হাঁফায়। ওইটুকু প্রাণীকে চট্‌কে পিষে থেঁৎলে মেরে ওর যেন আশ মেটে নি। চাকাগুলো যেন ওর থাবা।

দুপুর হলেও লোকে ভিড় করে দাঁড়ায়।

"কার ছেলে? কার ছেলে?"

কেউ জানে না কার ছেলে! অনেক খোঁজ করেও পাত্তা মেলে না।

নতুন লোক এসে ভিড় ঠেলে মাথা ঢুকিয়ে দেখে, আবার জিজ্ঞাসা করে, "আহা কার বাছা গো? কার কোলপোঁছা ধন —পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছিল গো!"

কার ছেলে কে জানে!

হয় ত ও কারো ছেলে নয়।

হয় ত ও মাটির সমস্ত ছেলের প্রতীক। ওর পায়ে মাটির মমতার বেড়ি।

সে টীনের চৌচালা আর নেই। তার জায়গায় পাকা দোতালা উঠেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লীলা বলে, "আর পারি না বাপু, টানাপড়েন করতে, এর চেয়ে সে টীনের চালা আমার ভাল ছিল!"

বিপিনবাবু হেসে বলেন, "তোকে কে টানাপড়েন করতে বলেছে মা? তুই চুপ করে' বসে' থাক্ না, সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। ঝি রয়েছে, ঠাকুর রয়েছে, ওরাই করুক না!"

পোনেরো বছরের মেয়ে গিন্নির মত বলে, "হ্যাঁ, আমি বসে থাকি, আর ঘরসংসার সব চুলোর দোরে যাক্ আর কি? আমি একদণ্ড বসলে চলে!"—চাবীর গোছাবাঁধা আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে এক এক ধাপে দুটো সিঁড়ি পার হয়ে লীলা ওপরে ওঠে যায়।

সস্নেহ হাসিতে বিপিনবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

আবার দুর্ দুর্ করে লীলা সিঁড়ি দিয়ে নামে। অপরিপাটি খোঁপাটা মাথায় অগোছাল ভাবে ঝুলে আছে। শেমিজটা আধ-ময়লা, তার উপর ধোপদস্ত শাড়ীর আঁচলটা কোথায় লেগে ছিঁড়ে ওড়ান হয়ে গেছে।

গিন্নিবান্নিদের ওসব বুঝি ভ্রূক্ষেপ করতে নেই! হয় ত সমবয়সী নারীর সঙ্গবিহনে তার কিছু শেখবার সুযোগ হয় নি।

দুর্‌ দুর্‌ করে নীচে নেমে লীলা বাবাকে একবার তাড়া দেয়, "তোমার তেল মাখা হল বাবা, কখন্‌ নাইবে আর কখন্‌ খাবে বল' ত !" বাইরের ঘরের বন্ধ দরজায় দুবার ধাক্কা মেরে আবার কাকে বলে, "আর কল ঘটর ঘটর করতে হবে না ! জামাকাপড় ছাড়' দেখি। ঠাকুর যে রেঁধে একঘণ্টা বসে আছে।"—এবং পর মুহূর্ত্তে রান্নাঘরে গিয়ে শ্রমারক্তমুখে ঠাকুরকে ধমক দেয়, "একটু হাত চালিয়ে কাজ করতে পার না ঠাকুর !"

পোনেরো বছর বয়স হলোই বা, তার ওপর সংসারের সব ভার ত'।

খানিক বাদে আবার বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ভেতরে টাইপ রাইটারের শব্দ তখনো তেমনি চলেছে। দরজাটা ঝণাৎ করে' খুলে' ভিতরে গিয়ে বলে, "এখনো উঠলে না তো ! দাঁড়াও !"

যে টাইপ রাইটিং করছিল সে ফিরে' চায়।

ফ্যাকাশে রোগাটে মুখে দুটি করুণ কালো চোখ, মাথায় পাৎলা লম্বা চুলগুলি কপাল ঝাঁপিয়ে যেন চোখে পড়তে চায় —ঠোঁটে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ম্লান একটু হাসি।

"এটা যে বড্ড জরুরি চিঠি !"—ছেলেটি মিনতির সুরে বলে, "বিলাসবাবু রাগ করবেন।"

"হোক জরুরি চিঠি, খেয়ে দেয়ে ওকাজ করলে আর সৃষ্টি রসাতলে যাবে না।"

"আচ্ছা এই লাইনটা।"

"তবে এই যাক্ তোমার চিঠি চুলোয়।"—চাবিগুলো যেখানে সেখানে লীলা টিপে দেয়। তার পর বলে, "কি হল দেখি এবার—বি এল টি ইউ এক্স। নাও ওঠ।"

ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়—ঢ্যাঙা, রোগা, একটু কুঁজোই হবে বোধ হয়।

"আমি কিন্তু বকুনি খাব।"

"তা খেয়ো, কিন্তু তার আগে ভাত খেয়ে নাও।"

ছেলেটি একটু হাসে। জামাটা খুলে' বলে, "তেল কোথা?"

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির চুলগুলি গুছি করে' ধরে লীলা চোখ দুটি বড় বড় করে' বলে, "তোমায় না কাল চুল কাটতে বলেছিলাম অনিল-দা? ওমা! এই বড় বড় চুল এখনো কাটো নি—এতে আর অসুখ হবে না! যাও শীগ্‌গীর চুল কেটে এস।"

পোনেরো বছরের মেয়ের গিন্নিপনার ভঙ্গীটি ভারি মিষ্টি নয় কি?

অনিল একটু হাসে, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ শান্ত ছেলের মত বেরিয়ে যায়।

—আবার রান্নাঘরে।—

ঠাকুর বকুনি খায়, ঝির ভাগ্যে ধমক জোটে। কেউ কোন কাজের নয়, যে দিকটা লীলা না দেখবে সেই দিকটাতেই সবাই সব কাজ পণ্ড করে' বসে' থাকবে!

মাঝে মাঝে তবু বলতে হয়, "না! ওঠানামা করে' পায়ের সূতো ছিঁড়ে গেল! আর পারি না বাপু!"

"ও বাবা, এখনো তোমার স্নান হ'ল না?"

"দেখি অনিল-দা, কি রকম চুল কেটে এলে। ওমা, সামনে ওই অত বড় বড় চুল রইল! আচ্ছা আজ থাক্, কাল কিন্তু আবার কাটাব।"'

"হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি বামুন না কি? আঁশ-সক্ড়ির বিচার নেই! সক্ড়ি হাতটা না ধুয়েই নূনের বোয়েমে দিলে!"

গয়লানি দুধ দিতে এসে হয় ত বলে, "হ্যাঁ মা, এ কি ছিরি হয়েছে গো! বাড়ীর গিন্নিবান্নিই না হয় নেই, নিজেও কি একটু সময় করে চুলটা বাঁধতে, গাটায় সাবান দিতে নেই?"

চাবী বাঁধা আঁচলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে লীলা বলে, "তুমি থাম বাপু, গায়ে সাবান দেব! আমার বলে মরবার সময় নেই। ও ঝি, বুড়ো হয়ে মরতে গেলে, এখনো আক্কেল হল না! খাবার জলের গেলাস কি পাতের বাঁ ধারে দেয়!"

লীলা ঝিয়ের ভুল শোধরাবার কাজে লাগে।

অনিল হাসে, বিপিনবাবু হাসেন, ঝিও একটু হাসে।

সবার অলক্ষ্যে একটি লোক বাড়িতে ঢোকে—শুক্‌নো খোসা ওঠা মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ, রোগা মুখে খাঁড়ার মত নাকটা পাখীর ঠোঁটের মত দেখায়। এই সমস্ত হাসাহাসির পিছনে নীরবে সে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়, তারপর নিঃশব্দ চরণে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

হয় ত সংসারের এই সব তুচ্ছ হাসি, আনন্দের কোন মূল্যই তার কাছে নেই!

তাই কি সে অবজ্ঞায় দূরে সরে' থাকে!

ব্যাঙের ছাতার মতই বাড়ি গজায় বটে দিনের পর দিন, এখানে সেখানে, রাস্তার ধারে ধারে।

বাড়ি গজায় বটে কিন্তু কেমন যেন বাড় নেই তাদের, কেমন যেন শ্রীহীন কাঙাল চেহারা। তারা যেন শুধু মানুষের মাথা গোঁজবার আশ্রয়,—হাত পা ছড়াবার, প্রাণ মেলবার জন্যে নয়।

কিন্তু বাড়ি ওঠে। সারা দিনরাত অক্লান্ত ভাবে সহর যেন একটু একটু করে' এগোয়—সারাদিন এদিকের সহরতলির আকাশ মজুরদের ছাদ পেটানোর শব্দে গানে গম্‌গম্‌ করে।

ছোট ছোট দোতালা আর একতালা, কোনটা বা কায়ক্লেশে তেতালার চিলকোটা পর্য্যন্ত ওঠে। কোনটার গায়ে বালিকাজ আর হয় না, ন্যাড়া ইটগুলো দাঁত বার করে' থাকে। সহরের সমৃদ্ধির স্রোতটা বুঝি এ দিক দিয়ে গেল না। একটি ক্ষীণ ধারাতে বুঝি মাটি একটু সরস হয়ে ওঠে মাত্র। তাতেই এই নিস্তেজ রুদ্ধবৃদ্ধি দোতালা আর তেতালাগুলি মাথা তোলে সারের পর সার।

আমেরিকার দেওয়া পাট, চামড়া ও গালার দামটা যায় কোথায় ?

হয়ত স্পেনের আঙুরের ক্ষেতের সার জোগাতে।

হয় ত আমেরিকাতেই ফিরে যায়—মোটরের কারখানায়—

চীনের দেওয়া কাঁচের দামটা বোধ হয় রেশম হয়েই ফেরে।

তবে শুধু তাই নয়, পুরোণো সহরের রাস্তাগুলোও চওড়া হ'য়ে ওঠে। মহাজনদের পাড়ায় ইমারতের আড়ালে দিন দুপুরে সূর্য্য অস্ত যায়।

আর এ দিকেও সুবোধবাবুর নতুন বাড়ি ওঠে।

দেয়ালটা বাঁকা—তা হোক! কোণের ঘরটা একটু অন্ধকার —তা থাক্। মানুষ মাথা গুঁজে ত থাকতে পারে! ফাঁকা মাঠের চেয়ে ত ভাল, পাতার ঘরের চেয়ে ত ভব্য।

ভব্য!

এ সহরতলির দেবতা,—জীর্ণ নির্জীব ভব্যতা! সে দেবতা নিজের মুখ নিজে সাহস করে' দেখে না; অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে ভিড়ের তালে পা ফেলে চলবার বৃথা চেষ্টায় পদে পদে হোঁচট খায়। বড় নয়,—ছোট-খাট মিথ্যার বোঝায় দিন তার দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।

সুবোধবাবু সামনের বড় সূঁচল দাঁতটি, সরু মুখের আগায় সঙীনের মত উঁচিয়ে একটু হাসির চেষ্টা করে' বলেন, "বনল না মশাই, মিস্ত্রীদের সঙ্গে বনল না। বল্লাম,—থাক্ তবে বেটা আমার বাড়ি দাঁত বার করে'ই থাক্, তবু তোদের দিয়ে কাজ করাব না—সেই থেকে আর বালিকাম করাই নি।"

সুবোধবাবু নতুন বাড়িতে বালিকাম পর্য্যন্ত আর কুলিয়ে উঠতে পারেন নি।

রাস্তার অপর পারের একতলা বাড়ি থেকে পরণের কাপড়টি লুঙ্গির মত করে' প'রে অজীর্ণ রোগের ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যিনি আলাপ করতে এসেছেন তাঁর বাড়িতে বালি ও চূণকাম দুই-ই হয়েছে।

সুতরাং তিনি পেছনে হাত দিয়ে মুখটা তুলে' বাড়িটা আর একবার পর্য্যবেক্ষণ করে' নাক একটু সিঁটকে না বলে'ই পারেন না, "কিন্তু দেখায় যে বড় খারাপ!"

সুবোধবাবু চটেন, একটু বিব্রত হন বোধ হয়; কিন্তু বাইরে হেসে বলতে হয়, "ও বাইরেটা দেখতে ভাল আর মন্দ! খোসা দেখব না শাঁস খাব বলুন? আমি মশাই খোসার চেয়ে শাঁসই বুঝি!"

—তারপর একটু পাল্টা আঘাত, বিনয়ে মধুর করে'... "ক'দিনই ত আপনাকে বলছি, আসুন না একটু পায়ের ধূলো

দিন্ না উপরে, দেখবেন কি হাওয়া আর কি চমৎকার 'ভিউ'—আপনাদের একতালা বাড়ির ওই সুখটি নেই মশাই! আপনি দোতালা না করে' অমন একতালা করলেন কেন?"

একতালার, সুবোধবাবু খুঁজেপেতে বোধ হয় একতালা বাড়ি করলেও যে ভব্যতা নষ্ট হয় না তার প্রমাণ দেন।

এমনিতর সুবোধবাবুদের বাড়ি ওঠে ব্যাঙের ছাতার মত সহরতলির রাস্তার ধারে ধারে।

এমনি করে সুবোধবাবুদের দিন যায় হাস্যকর মিথ্যার পর্দ্দায় নিজের ও পরের কাছ থেকে ব্যর্থ জীবনের সকল রকম দৈন্যকে আড়াল করবার অর্থহীন চেষ্টায়।

কিন্তু এই সুবোধবাবুরাও সহরের সমৃদ্ধির স্রোতের জন্যে নিঃশব্দে খাত্ খনন করে। এই সুবোধবাবুদের সামনে রেখেই সহর আপনাকে প্রসারিত করে। সহর যেখানে পা বাড়ায় সেখানে সবার আগে বাড়ি ওঠে সুবোধবাবুর।

সুবোধবাবুর বালিকাম হয় নি বাইরে। না হোক, ভিতরে চূণকাম আছে। ছোট্ট হোক, দুজনার বেশী তিনজনের বসবার জায়গা না কুলোক, বাইরের ঘর আছে একটি। নতুন পালিশ করা পুরোনো নীলেমে-কেনা টেবিল, হাতল ভাঙ্গা চেয়ার দুখানা কোন রকমে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে আছে। দেয়ালময় অবর্ত্তমান বর্ত্তমান বহু বৎসরের ক্যালেণ্ডারের ছবি।

সুবোধবাবু বাড়ি দেখাবার একটি লোক এতদিনে বুঝি পেয়েছেন।

সুবোধবাবু বাড়ি দেখাতে দেখাতে বলেন,—"এই যে নীচের দুটি ঘর দেখছেন, একটু আলো কম মনে হচ্ছে কি ?"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত বলেন,—"না তেমন আর কি ?"

অন্ধকারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,—সুবোধবাবু বলেন, "কিন্তু ভারী 'কুল'—গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলা শুয়ে আরাম।"

ঘরগুলোর অন্ধকারের দোষ এইবার কেটে যায়! ওগুলোতে যে গরম কালে দুপুর বেলা শুয়ে আরাম, তৈরীও বোধ হয় সেই জন্যে! কিন্তু সুবোধবাবু অতটা বলেন না।

দোতালায় ওঠবার সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুবোধবাবু নিজে থেকে বলেন,—"সিঁড়ি, মশাই, চওড়া করা আমি পছন্দ করি না, মিছামিছি জায়গা নষ্ট, এই ত আমরা দেড় ফুট চওড়া বাঙালী, আমাদের আবার বেশী চওড়া সিঁড়িতে কি হবে, কি বলেন ?"

তা ত বটেই!

দোতালায় ওঠা হয়।

"কি 'ফাইন ভিউ' বলুন ত এখান থেকে!"—

সঙীন দাঁতটি নীচের ঠোঁটের ওপর নামিয়ে এনে ভাবাবেশে খানিক সুবোধবাবু তন্ময় হয়ে থাকেন, তারপর চমক্ ভাঙ্তে বলেন,—" 'নেচার'-এর 'বিউটি' এমন মনকে মুগ্ধ করে!"

বিনয়ী নিমন্ত্রিতকেও বোঝা যায় 'নেচার'-এর 'বিউটি' মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেন,—"সত্যি বড় চমৎকার ভিউ ত!"

সুবোধবাবু 'নেচার'-এর 'বিউটি'র প্রসঙ্গ আর একটু দীর্ঘ করতে চান,—"কি সুন্দর বলুন ত, যতদূর দেখা যায় মাঠের পর মাঠ আকাশ গিয়ে ছুঁয়েছে"—কিন্তু বলবার আর বেশী কিছু খুঁজে পান না। সুতরাং,—"দেখলে ভগবদ্ভক্তি আপনি আসে, কি বলেন?"—ব'লে শেষ ক'রে অন্য প্রসঙ্গ ধরেন।

ব্যাঁকা হোক টেরা হোক ওপরের ঘর ক'টিও দেখা যায় স্থাপত্য শিল্পের চরম না হোক, পরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

সুবোধবাবু নিজের উদ্ভাবিত জানলার ছিট্‌কিনির নতুন কৌশলটা ব্যাখ্যা করেন, ঘরের নর্দ্দমার ঢালুতার প্রশংসা করেন, এবং বাজে কাঠের সস্তা জানলার কবাটগুলো যে শুধু ছেলেদের দৌরাত্ম্যেই ফেটে ও ফাঁক হয়ে সস্তার মত দেখায় তা বিশদভাবে জানান।

দু'ঘরে দুটি তক্তপোষ পাতা এবং একটি ঘরে একটি বার্ণিশ-ওঠা খাট; তক্তপোষ ও খাটে ময়লা বালিশ ও চাদর থাকায় বোধ হয় ভব্যতার হানি হয় না। বিছানা-পত্র অপরিষ্কার

থাকা অবস্থায় বাড়ি দেখতে কাউকে নিমন্ত্রণ করাটা সমীচীন হয়েচে কিনা মনে মনে সুবোধবাবুকে খানিকক্ষণ বিচার করতেই হয়। ময়লা বিছানার চিন্তাটা থেকে থেকে মনকে খোঁচা দেয়।

বলেন,—"আসবাব-পত্র যে বড্ড বেশী, জায়গা করে উঠতে পারি না।"

ঘরে স্থানের অভাব বটে, প্রতি ঘরেই তক্তপোষ বা খাট ছাড়া টীনের, কাঠের বা ইস্পাতের রঙ চটা ও রঙ বিহীন বাক্স ও তোরঙ্গের স্তূপ, তা ছাড়া আলনায় কাপড় জামা ছাতা ও জুতা আছে, তাকে বাসন আছে, হরেক রকমের শিশি বাক্স গেলাস ও খেলনা আছে। এই পরিবারটি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে উদ্বর্ত্তনের পথে সংগৃহীত কোন উপকরণ যে ফেলে এসেছেন এ কথা মনে হয় না।

সুবোধবাবু ঘরের ছবিগুলোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—"ছবিগুলোর একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি?"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত সুবিবেচকের মত চুপ ক'রেই থাকেন।

সুবোধবাবু বলেন,—"এক এক ঘরে এক একটি গ্রুপ করেছি, বুঝেছেন? এই ঘরে এই বাঁ ধার থেকে দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পরের পর ছবি। ও ঘরে অমনি শ্রীরামের। কেন 'আইডিয়াটা' ভাল নয়? এই ছবি

জোগাড় করতে কি কম হায়রাণ হতে হয়েছে মশাই। ঠিক পরের পর ছবি চাই—”

বিনয়ী নিমন্ত্রিত ঘাড় নেড়ে জার্ম্মাণীর ছাপা ছবির তারিফ করেন।

তৃতীয় ঘরের ছবির গ্রুপের কথা আর সুবোধবাবু উল্লেখ করেন না,—সে গ্রুপটা এখনো ভাল করে দানা বাঁধে নি।—সে ঘরে রাজা রাণীর ছবি আছে, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা আছে, আবার অর্দ্ধ উলঙ্গ রবিবর্ম্মার তিলোত্তমাও আছে।

এইবার তেতালা।

সুবোধবাবুর গতি হঠাৎ অত্যন্ত ধীর হয়ে আসে। তেতালায় একটি মাত্র ঘর। সুবোধবাবু জুতো খুলে নিঃশব্দে শিকলি খোলেন।

বিনয়ী নিমন্ত্রিতও দেখাদেখি জুতো খোলেন। সুবোধবাবু গোপন-সংবাদ. জানাবার মত অত্যন্ত অস্পষ্টস্বরে বলেন,—“ঠাকুর ঘর।”

বিনয়ী নিমন্ত্রিত মুখে ভক্তি ও সম্ভ্রমের ভাব আনবার চেষ্টা করেন।

সুবোধবাবুর কথা সুরু হয়,—“সিংহাসনটি দেখছেন—কোথাকার বলুন ত? একেবারে খোদ দ্বারকা থেকে আনা। আর এই ঘণ্টাটি হচ্ছে কামাখ্যার! তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে

এই বয়সে ভারতবর্ষের এধারে ওধারে কোন তীর্থ আর বাকী নেই।”

তারপর একটু হেসে,—“এই কোশা কুশি কমণ্ডলু ধূপদানি—এসব কাশী থেকে আনা, আর এই চামরটায় হাত দিয়ে দেখুন না, সত্যিকারের চমরীর লোমে তৈরী, নেপালে পশুপতিনাথ দেখতে গিয়ে এক নেপালির কাছে কিনে এনেছিলাম। বাজারে সব নকল। এমন হয়ে গেছে মশাই এই ঠাকুর ঘরটিতে না বসলে আমার পূজোই হয় না, তা ছাড়া যে এঘরে এসেছে সে-ই বলেছে এঘরে কেমন একটি যেন শান্তির ভাব আছে, মন যেন আপনি নরম হয়ে আসে—কেমন না ?”

বিনয়ী নিমন্ত্রিত ঘাড় নাড়েন।

“গুরুদেব ত ঘরে ঢুকেই বল্লেন,—তো বেটার ওপর ভগবানের অশেষ কৃপা রে সুবোধ।—বল্লাম,—কেন বাবা পরিহাস করছেন !—বল্লেন,—না রে বেটা, এঘরে যেন শান্তির মন্দাকিনী অনাবিল ভাবে বইছে !—ঠিক ওই কথাটি বলেছিলেন,—যেন শান্তির মন্দাকিনী অনাবিল ভাবে বইছে !”

খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর সুবোধবাবু বলেন,—“সকালে দুটি, সন্ধ্যায় দুটি, এ দুটি ঘণ্টা আমার এখানে ধরাই আছে, আর তখন যদি বাড়ির সব পুড়ে ছারখারও হয়ে যায় কারুর এমন সাধ্য আছে আমায় ডাকে !”

বাড়ি দেখা সমাপ্ত হয়। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন কিনা বলা যায় না। বলেন,—"বেশ বাড়িটি!"

অত্যন্ত খুশী হয়ে সুবোধবাবু বলেন,—"তাহলে ভাল লাগল! এ সমস্ত নিজের প্ল্যান করা মশাই!"

* * * *

মানুষ সহর তৈরী করে। সহর সুবোধবাবু তৈরী করে তার শোধ নেয় কি?

সহরের ছাঁচে মানুষ ঢালাই হয়ে অনেক কিছু হয়। কিন্তু সব চেয়ে বিসদৃশ বুঝি সুবোধবাবু।

প্রকাণ্ড একটা প্রহসনের নায়ক ভুলে গেছে সে অভিনেতা মাত্র।

তবু মনে হয় সুবোধবাবুর জীর্ণ নির্জীব ভব্য দেবতা কোথায় যেন আপনার নিষ্ফলতায় ক্ষুব্ধ আক্রোশে মাথার চুল ছেঁড়ে।

দূরের গাঁ থেকে কে একজন ছেলের খোঁজে এসেছে।

পুরানো বাসিন্দারা কেউ কেউ তাকে চেনে।

"আরে লখ্খিকান্ত যে, বলি এদিকে কি মনে করে!"—মেটে ঘরের দাওয়ায় পথের ধারে শিবু যেন ওৎ পেতে বসে থাকে—কারুর পেরুবার যো নেই।

শুক্‌নো মুখে লক্ষ্মীকান্ত দাঁড়িয়ে। বলে, "ছেলেটার খোঁজে এলাম ভাই, এই দুদিন পাত্তা নেই। মাগী ত দাঁত-কপাটি লেগে পড়ে আছে। এদিক পানে দেখেছ নাকি?"

কৃত্তিবাস তামাক টান্‌তে টান্‌তে চম্‌কে উঠে কলকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"কোন্ ছেলে গো!—তোমার সেই মরণ নাকি?"

"হ্যাঁগো—সেই পাঁচ বছরেরটি দেখেছিলে মনে নেই! সেও পাঁচে পা দিলে আর এখানকার বাস উঠোলাম না!"

শিবুতে কৃত্তিবাসে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। শিবু কি যেন ইসারা করে—কৃত্তিবাস কথা কইতে গিয়েও সাম্‌লে নিয়ে আবার হুঁকো মুখে তুলে টান দেয়।

লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাসা করে—"দেখেছ নাকি ভাই—এদিক পানে ?"

শিবু ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে, "এদিক পানে ত আসেনি ভাই। গাঁয়ে ভাল করে খোঁজ করেছ ত ?"

লক্ষ্মীকান্ত এসে দাওয়ার একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে,—"তা কি আর বাকি রেখেছি ভাই—এ দুদিন আর কারুর মুখে অন্নজল নেই।"

শিবু কৃত্তিবাস দুজনেই চুপ করে থাকে।

লক্ষ্মীকান্ত খানিক বাদে নিজে থেকেই বলে, "মাগীটা এবার ক্ষেপে যাবে। দুটো মরল পেটে, আর তিনটে আঁতুড়ে। এটা হবার সময় সবাই বল্লে, হেলায় অছেদ্দায় রাখ দেখি, শত্তুর হলেও যেতে পারবে না—তাই না মরণ নাম !"

আবার সবাই চুপচাপ।

লক্ষ্মীকান্ত বলে যায়, "তা লোকের কথা মিথ্যে নয় ! হ'ল যখন তখন যেন প্যাকাটির হাত পা, কাঁদতে পারে না—চিঁচি করে, ভাবলুম এও বুঝি চল্ল। কিন্তু বাঁচল, একটু একটু করে সেই প্যাকাটির হাড়ে মাংস লেগে এক বছরের ছেলে এমন দাম্বালে হ'ল যে, সামলায় কার সাধ্যি ! গুরুঠাকুর লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে গেলেন,—কিছু ভয় নেই—এ ছেলে জলে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না—ওর অখ্যায় পরমায়ু।"

শুক্‌নির মোটর লরি ইটখোলা থেকে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়।

কৃত্তিবাস মুখটা নীচু করেই রাখে, তোলে না! শিবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মীকান্তের কথা শোনে।

"...দুদিন ধরে মাগীকে সেই কথাই ত বোঝাচ্ছি, তা মেয়েমানুষ কি বুঝতে চায়! আমি বলি তিন তিন বার অমন বাঁচা যে ছেলে বাঁচে সে ছেলের কখন কিছু হতে পারে না। দেখ্‌ ছেলে তোর ঠিক ফিরে আসবে, ঠাকুর একটু ছলনা করছেন বই ত নয়। একবার কলেরায় ছেলে এই যায় সেই যায়, দুদিন বাদে ওলাবিবি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, আর একবার অমনি পয়সা গিলে ফেলে ছেলে নীলবরণ হয়ে একেবারে যায় —তবু কিছু হ'ল না ত। মরবার হলে ও আগেই মরত। মাগী কিছুতেই বুঝবে না—খালি বলে,—ওগো পাছে যত্ন-আত্তি করলে চলে যায় ভয়ে, ভালো করে কোলে কোরে আদর-যত্ন করতে পাই নি যে গো, বুকটা ফেটে গেছে, তবু বাছাকে বুকে থেকে নামিয়ে রেখেছি..."

লক্ষ্মীকান্ত চোখের জল মোছে।

শিবু কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করে। বলে, "আচ্ছা আমাদের অঘোরের খবর কি বলতে পার?"

"—অঘোর হাজরার?"

"—হ্যাঁ-হ্যাঁ এখানকার জমি বেচে সাত আটশ টাকা পেয়েছিল না ?"

"অঘোর ত এক মাস হ'ল মরে গেছে।"

"মরে গেছে কি রকম !"

লক্ষ্মীকান্ত মাথা নাড়ে। বলে, "হ্যাঁ মরেছে—তবে মরেছে, না বেঁচেছে।"

শিবু কৃত্তিবাস কৌতূহলী হয়ে থাকে।

"সেই সুন্দরী বৌ-টা ছিল না !"

"হুঁ !"

"সে-ই মেরে গেল আর কি ! অঘোর ত বৌ বলতে অজ্ঞান ! সাত শ টাকার ত ছ'শ বৌ-এর গয়নাই গড়িয়ে দিলে—চাষা-ভূষোর ঘরে তেমন গয়নার নামও কেউ শোনে নি। আর ছুঁড়ি করলে কি—বছর ঘুরতে না ঘুরতে এক বেটা খোট্টা কাপড়-ফিরিওয়ালার সাথে জুটে বেরিয়ে গেল—"

"তারপর ?"

লক্ষ্মীকান্ত ছেলে হারাবার কথা কতকটা বুঝি ভুলেছে, উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকে, "তারপর আর কি ! অঘোর ত পাগলের মত হয়ে গেল—সারা সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়, কোন দিন ঘরে ফিরে দুটো রাঁধে বাড়ে—কোন দিন ফেরেও

না—ছেলেটাকে নিয়েই মুস্কিল আর কি! ছুঁড়ি এত বড় রাক্ষুসী, ছেলেটাকে ফেলে গেছে চলে!"

শুধু পরের কথা বলেই মানুষ বোধ হয় নিজের কথা ভুলতে পারে।

লক্ষ্মীকান্ত কৌতূহলী শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে,—"ছেলেটাকে কোন দিন বা আমরা এনে রাখি, কোন দিন বা বিশুদের বাড়ি নিয়ে রাখে।

"অঘোরকে বল্লে ত আর বুঝবে না। যে ডাইনি বেটি ভাতার-পুত ফেলেই পালাল, তাকে খুঁজে কি হবে বলতে গেলে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে, কোন দিন বা বুড়োমদ্দ কেঁদেই ফেলে। কাজ নেই কর্ম্ম নেই, ঘরে যে কটা টাকা ছিল তাতে আর ক'দিন চলবে, তবু তার খোঁজার বিরেম নেই।"

কৃত্তিবাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "সে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়!"

—"না পেলে ত ভাল ছিল, পেয়েই যে হ'ল গোল। আর পেলে কোথায়? সেই পুরোনো সহরের উত্তরে একটা বেবুশ্যে পাড়ায়। ছুঁড়ির সেখানে হাড়ির হাল হয়েছে, থাকে একটা ঘুপ্‌সি খাপরার ঘরে; গয়নাগুলো সব সে বদমাসটা নিয়ে নিয়ে বেচেছে। সে বেটা কোন দিন আসে কোন দিন আসে না, এলে মদ খেয়ে মারপিট করে। ছুঁড়িটার দুরবস্থার আর

সীমে নেই, কোন দিন খেতে পায় না পেট ভরে, সর্ব্বাঙ্গে মারের কালসীটে দাগ। তাই খুঁজে পেয়ে অঘোরের কি আহ্লাদ, যেন স্বগ্‌গ হাতে পেল। তারপর সে ছুঁড়িকে একটি কথা কয় না, শুধু বলে,—তুই ঘরে চ, তোর গয়না আবার আমি রোজগার করে গড়িয়ে দেব—তুই শোন্, যা চাস্ তাই হবে, শুধু তুই ঘরে চল্। কিন্তু সে এত বড় হারামজাদী ছুঁড়ি—না খেয়ে মার খেয়ে সেখানে পড়ে থাকবে সেভি আচ্ছা, তবু কিছুতে এল না। বল্লে, তোর গরজ থাকে তুই এখানে এসে দেখে যাস্!"

রক্ত গরম হবার কথা বটে। শিবু বলে, "আমি হলে অমন বৌকে খুন করে ফাঁসি যেতাম।"

"হুঁ! খুন করবে অঘোর! সবাই বল্লে, নালিশ কর—অঘোর! ফুস্‌লে বৌকে বার করে নিয়ে গেছে বলে নালিশ ঠুকে দে। ও বেটারও জেল হয়ে যাবে, আর তোর বৌকে চাস্ তাও পাবি। অঘোর শুধু বল্লে 'উঁহুঁ', তারপর ক'দিন দেখি না ভোর চারটে না বাজতে অঘোর বেরুতে সুরু করেছে।

" 'কোথা যাও অঘোর?'

" 'একটা কাজ পেয়েছি, ভাই।'

"কাজ করে জেটিতে, যেতে আসতেই পাঁচ কোশ! বল্লাম—পাঁচ কোশ হেঁটে কাজে যাবার কি দরকার, এখানে কি একটা কাজ জুট্‌ত না?

"বলে, 'একটু বেশী রোজগার হয় ভাই!'

"রোজগার না হয় বেশী কিন্তু প্রাণটা ত রাখা চাই, আর পেট ত দেড়খানা, একটা মদ্দ আর একটা ছেলে। বেশী রোজগারের দরকারই বা কি! অঘোর আর কথা কয় না। অনেক পেড়াপিড়ি করতে বলে, 'সেখানে কিছু দিতে হয়—বড্ড কষ্ট।'

"শুধু যায় না, রোজগারের সমস্তটা সেখানেই ঢেলে দিয়ে আসে। ছেলেটাকে খাইয়ে নিজে আধপেটা হয়েই থাকে। তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে, তাতেও হয় না, আবার রাতে বাড়তি খাটে—নইলে নাকি সেখানে চলে না! চলবে কি করে? অঘোর টাকা দেয় আর সে বদমাসটা তাতে মদ খায়। অঘোর রক্ত তুলে টাকা দেয়, পাছে ছুঁড়ির কষ্ট হয় বলে, আর তারা মাগী-মদ্দে তাতে ফুর্ত্তি করে। খেটে খেটে দুমাসে অঘোরের বিষ্টু পাঁজরা বেরিয়ে পড়ল!"

দম নেবার জন্যে লক্ষ্মীকান্ত একটু থামে। কাছেই কোন নতুন বাড়ি থেকে তালে তালে ছাত পেটার শব্দ আসে।

"গাঁয়ের সবাই বল্লে, 'অঘোর তুই পুরুষ মানুষ না কি? তোর বৌ বেরিয়ে আরেক জনকে নিয়ে পড়ে আছে আর তুই তার খরচ জোগাচ্ছিস্!'

"অঘোর চুপ করে শুধু শোনে,—রা করে না।

"আমরা বল্লাম, 'পুরুষ মানুষ তোর ভাবনা কি অঘোর?

আবার একটা বে কর, সুন্দরী মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে নেই, তার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে জোগাড় করে দেব।'

"অঘোর শুধু একটু হাসে। ছুঁড়িটা ঘরে ঢুকতে দেয় এই যেন ওর কত বড় ভাগ্যি। দিনের পর দিন ট্যাঙ্গস্ ট্যাঙ্গস্ করে জেটিতে যায় জাহাজের মাল খালাস করতে, সেখান থেকে আবার লম্বা পাড়ি ছুঁড়িটার কাছে। রাত এগারোটায় ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফেরে। তাই কি ছুঁড়ি ছেদ্দা করত—দুদিন টাকা না পেলে দূর করে দিত খেদিয়ে। তবু সেখানে যাওয়া চাই।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি! ভগবানেরও বুঝি আর সইল না, এমনি ত হাড়গুলো জির্-জির্ করত—সেদিন 'কেরেন' না কি বলে বাপু, তারই চেন খুলে গিয়ে একেবারে একশ মণের বস্তা পড় ত পড় ওরি মাথায়।"

একটু চুপ করে লক্ষ্মীকান্ত বলে, "গিয়ে আর চিনতে পারলাম না, থেঁৎলে গুঁড়িয়ে সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।"

সবাই মুখ নীচু করে কি যেন ভাবে।

লক্ষ্মীকান্তও বুঝি ছেলের কথা ভুলেছে। মাথা নীচু করেই বলে, "এখানকার বাস টাকার লোভে যে ক'জন তুলেছে, তাদের ভালো আর কার হ'ল বল। হাজার হোক্ বাস্তু-দেবতার

অপমান ত একটা বটে! রাজবল্লভ ত সব ক'দিন ধানের কারবার করতে গিয়ে ফুঁকে টুঁকে দিয়ে হেথাকার ইটখোলায় কাঁচা ইট গড়ছে। রঙ্গলাল ত দেশছাড়া। হট্ করে কাউকে না বলে কয়ে, সস্তার লোভে বিঘে দশেক জমি কিনে বসল, তার দলীল-পত্রই কাঁচা। জমি কিনতে যা গেছল তা গেছল, তার ওপর যে কটা টাকা এখানকার জমি বেচার তবু ছিল, মকদ্দামার পর মকদ্দামা চালাতে তাও ঢাকী-শুদ্ধু বিসর্জ্জন হয়ে গেল। সব খুইয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তার আর পাত্তাই নেই এই দু'বছর। ভালো কারুর হয় নি এখানকার বাস উঠিয়ে!"

শিবদাস পথে যেতে যেতে আড্ডা দেখে চমকে দাঁড়ায়। বলে, "আরে লক্ষ্মীকান্ত যে, খবর কি!"

তারপর এসে দাওয়ার ওপর উঠে বসে।

"খবর আর কি ভাই; এই বলছিলাম—বাপ-পিতাম'র ভিটে ছেড়ে গিয়ে ভালো কারু হয় নি, টাকার লোভ না করে এখানে থাকলেই ভালো হত।"

শিবদাস উত্তেজিত হয়ে বলে, "ভালো হয় নি? ভালো হয়নি কি রকম!—খুব ভালো হয়েছে। আমরা আহাম্মুক, তাই এখানে মরতে পড়ে আছি। আর আমিও এবার পাত্তাড়ি গুটোচ্ছি। সেই পয়লা'স্তক জমিটা কেনবার জন্যে শুকনি

ঝুলো-ঝুলি করছে—শেষে চটে গিয়ে কোন্ দিন আগুন লাগিয়ে দেবে—কাজ কি বাবা আমার ঝঞ্ঝাটে, আপনিই সরে পড়ব ভালোয় ভালোয় ; তবু ছানাপনাগুলো নিয়ে শান্তিতে থাকবো একটু। এই যে কাদের ছেলেটা পরশু···

শিবু কৃত্তিবাস প্রবল ভাবে ইসারা করে, কিন্তু কাণা শিবদাস বলে যায়,—"লরি চাপা পড়ে মরল, তার বাপমার কথা ভাব দেখি একবার···সবেধন নীলমণি, পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছিল। মরা দেখতে পাওয়া দূরে থাক, এখনও খবরটা পর্য্যন্ত পায়নি। আমার সহরের সুখে কাজ নেই বাবা, ছেলেপুলেগুলো অপঘাত থেকে ত বাঁচবে।"

শিবু কৃত্তিবাস বোধ হয় মাটিতে মিশে যেতে চায়।

লক্ষ্মীকান্তের সমস্ত মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে যায়, খানিক উদ্ভ্রান্তের মত বসে থেকে সে হঠাৎ হন্-হন্ করে বেরিয়ে যায়।

শিবদাস হতভম্বের মত দুজনের মুখের দিকে চায় শুধু।

সন্ধ্যেবেলা হরি ময়রার দোকানে যেতে যেতে শিবু বলে, "দেখ কৃত্তিবাস, আমি আর ঠাকুর-দেবতা মানিনে।"

কৃত্তিবাস একেবারে আকাশ থেকে পড়ে' বলে, "তার মানে?"

শিবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলে, "দেখ বিলেত থেকে শুধু মানুষ আসেনি, ঠাকুর-দেবতাও নতুন নতুন এসেছে।"

কৃত্তিবাস আবার চলতে সুরু করে বলে, "তুই পাগলের মত যা-তা বকিসনি, ঠাকুর-দেবতার কান আছে।"

শিবু তাকে থামিয়ে বলে, "থাকুক কান, আমি পরোয়া করি না, কান থাকলেও জান্ আর আমাদের ঠাকুর-দেবতার নেই তুই জেনে রাখিস। বিলেতের দেবতাদের সঙ্গে তারা আর এঁটে উঠতে পারছে না।"

পাপ হবার ভয়ে কৃত্তিবাস নাক কান মলা খায় কিন্তু শিবু ছাড়ে না, নিজের নতুন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে করতে বলে—

"পারলে আর তিন তিনবার যমের হাত এড়িয়ে লক্ষ্মীকান্তের বেড়ী-পরা ছেলে লরি চাপা মরত না...দেবতা কত রকমই ত হতে পারে, ওই মোটর লরিরও যে দেবতা নেই কে বলতে পারে! আচ্ছা মা-শেতলার কথাই ধর্, মা যদি জাগ্রতই হত তা হলে টীকে দিয়ে যারা বসন্ত আটকাতে চায় তাদের নির্ব্বংশ করে ছাড়ত না?...তারা ত দিব্যি বেঁচে আছে দেখছি ভাই।"

শিবুর সঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই বোধ হয় কৃত্তিবাস আরো জোরে জোরে পা চালায় কিন্তু শিবু তার নাগাল ধরে বলে, "তুই দেখিস্ এবার, আমি বারোয়ারীর চাঁদা দেব না।"

* * * *

সহর এগুচ্ছে নাকি?

সহর এগুচ্ছে হয়ত, কিন্তু অত্যন্ত নিস্তেজ ভাবে। পরিণত হবার আগেই কেমন যেন তার প্রাণ-শক্তি গেছে ফুরিয়ে।

এরি মধ্যে ক'বারের বর্ষায় সুবোধবাবুদের বাড়ির ওপর প্রচুর শ্যাওলার ছোপ ধরেছে, ওধারের প্রতিবেশীর একতালা বাড়ির জৌলষ গেছে ঘুচে।

কে বলবে এ সেদিনের সহর! সমস্ত সহর-সীমান্তের ওপর অকাল-বার্দ্ধক্যের একটা ছাপ, রাস্তা-ঘাট এরি মধ্যে শ্রীহীন। ধূলোমাখা ময়লা দেয়ালে উড়ছে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের কাগজ। পথের ধারে আঁগাছা বাড়ছে, সুবোধবাবুর ভব্যতা বুঝি জোড়া-তালিতে ছেয়ে গেল।

রাত্রে মিট্ মিট্ করে সহরের এ প্রান্তের বিরল আলোগুলি জ্বলে—দিনে ওঠে আকাশের দিকে নির্জীব নগরের ধূলিমলিন একটু জীবনের কোলাহল!

নতুন বাজারই একটু বুঝি জমে উঠেছে। পাকা জায়গাটুকুতে

আর ধরে না, পাশে টিনের ছাউনি তুলতে হয়েছে। তার তলায় ভোর না হতে দূর-দূরান্তের চাষীরা এসে জায়গা জুড়ে বসে। মেছো বাজারের পাটা ধুয়ে তুলতে কোন দিন বিকেল হয়ে যায়। ফড়েরা রাতে পর্য্যন্ত কেরাসিনের কুপি জ্বালিয়ে বসে থাকে। বলা ত যায় না রাত-বিরেতেও লোকের দরকার পড়ে। এ ত আর গাঁয়ের হাট নয়।

শিবু এক-একদিন রাতে আসে বাজারে টহল দিতে। না, বাজার তদারকের কাজটা সে ঠিক পায়নি, কিন্তু তার ধরণ-ধারণ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

দশটা না বাজতেই সহর এসেছে নিশুতি হয়ে। বাজারের ভেতর অন্ধকার। সওদার ওপর দরমার চট্ চাপা দিয়ে থলে মাথায় দিয়ে ফড়েরা ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। শুধু একটি কোণে জ্বলছে মিট্-মিট্ করে একটি ডিবিয়া।

ধূমবহুল সেই ডিবিয়ার আলোটি ঘিরে বসে আছে মুড়িশুড়ি দিয়ে তিনটি লোক। তাদের ছায়া বিশাল হয়ে বিস্তৃত ভাবে নড়ছে ওপরের টিনের চাল থেকে বাজারের মেঝের ওপর। আলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা যেন কি পড়ছে। নিস্তব্ধ বাজারে শোনা যাচ্ছে সেই গুঞ্জন।

শিবু এসে সেখানে দাঁড়ায়। মুরুব্বির মত বলে,—"কি গো হাজরার পো, রাত কটা হ'ল হুঁস আছে? এখনো

দোকান-পাট না তুললে রাতের ডবল ভাড়া দিতে হবে যে!"

হাজরার পো পড়া থামিয়ে মুখ তুলে চায়। শিবুকে দেখে কুণ্ঠিত ভাবে হেসে বলে,—"বোসো বোসো দাদা! দোকান-পাট ত কখন তুলে দিয়েছি। কি করি ঘুম আসে না, তাই পড়ছিলাম একটা বই।"

শিবুকে তু'বার অনুরোধ করতে হয় না। মাতুরের একধারে বসে পড়ে বলে, "কি পড়া হচ্ছে, পাঁচালী নাকি?"

হাজরার পো বলে, "না দাদা পাঁচালী হবে কেন? এ খুব মজার বই, খুনোখুনির ব্যাপার!"

শ্রোতাদের ভেতর একজন উৎসাহভরে বলে, "গোয়েন্দাটা কি ধড়িবাজ! শালা এমন ভোল ফিরিয়েছে যে চেনবার জো নেই।"

শিবু একটু নাক শিঁটকে বলে, "কই পড় দেখি শুনি! আজকাল কি সব বই হয়েছে!"

মোটা হলদে রঙের কাগজে ধ্যাবড়া করে ছাপা চটি বই, এরই মধ্যে অনেক হাত ফিরে তেলে ময়লায় পাতাগুলির অত্যন্ত তুরবস্থা হয়েছে। মলাট গেছে ছিঁড়ে, পাতাগুলি অধিকাংশ দোমড়ান। সেই বইটি সযত্নে ডিবিয়ার কাছে মেঝেতে রেখে বানান করে করে ধীরে ধীরে পঞ্চু হাজরা পড়তে সুরু করে।

শিবু খানিক মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করে তারপর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "কি এমন আদিখ্যেতার বই বাপু! পাঁচালী পড়তে পার না এর চাইতে। না হয় যাত্রার বই। সেদিন যে পড়ছিল আমাদের কয়লার ডিপোর ত্নলাল। কি বলে,—ধ্রুব-চরিত্র যাত্রাভিনয়। পড়তে পড়তে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে!"

ডিটেক্‌টিভ বই-এর নিন্দা শ্রোতাদের বিশেষ পছন্দ হয় না। রাখাল মাইতি প্রতিবাদ করে বলে,—"আরে দাদা এ বইও ভাল। তুমি মাঝখান থেকে শুনে কি বুঝবে! সেইখানটা শুনিয়ে দাও ত হাজরা। চালের গুদোম থেকে বস্তা কেটে যেখানে লাশ বের করলে! পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেবে'খন!"

পড়া কিন্তু আর জমে না। পঞ্চু হাজরা বইটা মুড়ে ফেলে মাত্নরের তলায় রেখে বলে, "থাক কাল পড়ব'খন, এখন খবর কি বল দাদা! টেরাম আসছে নাকি এদিকে?"

শিবুর এই জন্যেই আসা। এতক্ষণে নিজের মর্য্যাদা ফিরে পেয়ে সে গম্ভীর হয়ে ওঠে। কিছুদিন ধরে তার পসার একটু নষ্ট হয়েছে। সাধু ময়রার আড্ডা যাওয়া অবধি তাকে যেন ততটা সমীহ আর কেউ করে না। সহরের দামী দামী সব খবর নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু শোনবার লোক নেই। এ সব খবর

ত আর গায়ে পড়ে শোনান যায় না। শিবু সকলের উপর তাই একটু চটেই থাকে আজকাল। এদিক ওদিক সে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন কিন্তু কোথাও ভাল করে জমতে পারে না। আজকাল সহরের লোকগুলোর কি হয়েছে কে জানে! কারুর যেন কিছুতে গা নেই।

আজ এতদিন বাদে বুঝি তার একটু সুযোগ মিলেছে। সে সুযোগটুকু সহজে সে বাজে খরচ করতে রাজী নয়। সহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে শিবু ছাড়া কে তার সঠিক খবর রাখে! কিন্তু শিবু ত আর ছ্যাবলা নয়। পেটের কথা সে ধরে রাখতে জানে। খবর সে সহজে বার করে না। টেরামের আসল ব্যাপারটা সে রয়ে-সয়ে একটু বার করবার উদ্যোগ করে—

হঠাৎ রাখাল মাইতি বলে বসে, "টেরাম আসবে বইকি! সহর যখন হয়েছে তখন হাওয়া গাড়ি, টেরাম, সবই আসবে।"

শিবুর রাগ ত হতেই পারে। ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে সে বলে, "হুঁ, সহর হলেই টেরাম আসবে কেমন রাখাল!"

রাখাল নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলে,—"নিশ্চয়ই!"

শিবু বিজ্ঞের মত একটু হাসে, তারপর বলে, "টেরাম কোম্পানির পয়সা কামড়াচ্ছে কেমন?"

এ কথার সুরটা রাখালের পছন্দ হয় না, বলে, "পয়সা কামড়াবে কেন; তাবলে যেখানে লাভ সেখানে পয়সা

ফেলবে না? সহরে টেরাম চালাবে না ত কি চালাবে জঙ্গলে?”

“না না সহরেই ত চালাবে গো! সখ করে টেরাম গুলোকে এক-একবার করে সহরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে যাবে, কেমন?”

রাখাল মাইতি একটু রেগেই বলে,—“হাওয়া খাইয়ে নে যাবে কেন? চড়বার লোক নেই!”

“খুব আছে! এই তুমি আছ আমি আছি, আমাদের পঞ্চানন আছে, আমরাই টেরাম কোম্পানিকে রাজা করে দেব।”

রাখাল হয়ত কিছু বলত, কিন্তু তার বলবার আগেই সুর পাল্টে গম্ভীর হয়ে শিবু বলে,—“না হে না, উড়ো খবর কোথায় কি শুনে, অমন যা-তা বোলোনা। বুঝলে, লোকে হাসবে।”

রাখাল এ-সদুপদেশ গ্রাহ্য করে না, চটে গিয়ে বলে,—“লাটসাহেব তোমার সঙ্গে খানা খেতে-খেতে কি খাঁটি খবরটা দিয়েছে তাহলে শুনি।”

শিবুও এবার চটে উঠে বলে,—“আদার ব্যাপারী তোমার জাহাজের খবরে দরকার কি বাপু! টেরাম এলেও ওই খানে বসে বসে, ঝাড়া দিয়ে দু'পয়সা গোছ পান বেচবে, না এলেও তাই। টেরামের সঙ্গে কি সম্পক্কোটা?”

ট্রামের খবর অবশ্য রাখাল মাইতি প্রথম জিজ্ঞেস করেনি, করেছে পঞ্চানন। কিন্তু সে কথা চাপা পড়ে গেছে।

রাখাল কথায় প্যাঁচ দিয়ে বলে,—"সম্পক্কো ত তোমার! আর তা হবে না! আমি ত শুধু পান বেচি, আর তুমি যে ঘাস কাট শুকনির রাস্তায়।"

এবার দুজনেই মারমুখো হয়ে উঠেছে। পঞ্চানন আর দয়াল কোন রকমে দুজনকে শান্ত করে।

শিবু তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বসে বটে কিন্তু মন তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। টেরাম সম্বন্ধে ভাল-ভাল কটা খবর তার জানা। গায়ে পড়ে ত আর সেগুলো বলা যায় না। রাখালটা আহাম্মুখের মত মাঝে থেকে তাকে চটিয়ে দিয়েই সব মাটি করে দিলে!

পঞ্চানন আর টেরামের কথা জিজ্ঞেস করে না। তার ভাব-গতিক দেখে বোঝা যায় এবার সে শোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দয়াল বার-দুএক হাই তুলে বলে,—"যাই ভাই, ছেলেটা একলা দোকানে পড়ে আছে।"

দয়ালের সঙ্গে রাখাল মাইতিও ওঠে। শিবুর প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে পঞ্চাননকে বলে,—"কাল আবার বই শুনব হাজরা।" তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেলে, "বইটা একবারটি বার কর না ভাই!"

পঞ্চানন হেসে বলে,—"কেন ?"

"মেয়েটাকে যা ফাঁদে ফেলেছে, বাঁচবে কিনা, না জানলে ঘুম হবে না রাতে।"

পঞ্চানন বলে,—"আরে পাগল না কি! সে এখন অনেক পাতা! অত পাতা পড়বে কে এখন!"

রাখাল ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কাজের উৎসাহ নিয়ে প্রায় চুপি চুপি বলে,—"আরে সব পড়বে কেন! পাতা কটা উল্টে বলে দাও না ভাই মেয়েটা বাঁচবে কি না।"

এ পরামর্শ দয়াল ঘোষেরও অত্যন্ত ভালো লাগে। সায় দিয়ে সেও বলে,—"পড় না ভাই, তাতে আর কি ?"

কিন্তু এত বড় গর্হিত কাজ পঞ্চানন হাজরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সে বলে,—"না ভাই, তাও আবার হয় নাকি! তাহলে ত বই না পড়লেই হয়!"

রাখাল আর একবার অনুরোধ করে, তারপর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নেয়। পঞ্চানন তার সঙ্কল্পে অটল। অমন করে আগে থাকতে সব বলে দিলে বইএর আর থাকে কি ? আর পড়ুয়া হিসেবে তার মর্য্যাদাটাও যে যায়।

শিবু আরও খানিকক্ষণ বসে থাকে জোর করে। পঞ্চানন এদিকে হাই তুলতে আরম্ভ করেছে। নাঃ, আর সহরের কথা

উঠবে না। টেরামের কথাটা চাপাই পড়ে গেল, আহাম্মুক রাখাল মাইতির জন্যে।

শিবুকেও এবার উঠতে হয়। অন্ধকার বাজার পার হয়ে যেতে যেতে সাধু ময়রার আড্ডাটার জন্যে সত্যি তার দুঃখ হয়। সাধু ময়রার দোকানটা ফেল হয়ে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় নি। আর কোথাও সে জমাতে পারছে না ভাল করে। সহর সবাই ছেড়ে ছিল, ছাড়েনি শুধু একলা সে। তেঁতুল গাছের পাশে পাতার কুঁড়ে নিয়ে জোর করে সে চেপে বসেছিল। কিন্তু সহরই যেন তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে আর সমীহ করে না।

রাস্তাগুলো এখন নির্জ্জন। বাদাম তলার মোড়ের সমস্ত দোকানের ঝাঁপ অনেক আগেই উঠে গেছে। শুধু একটি জায়গা থেকে আলো দেখা যায়। হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকান এখনো খোলা।

সেই দিকে উৎসুক ভাবে দুবার চেয়ে হন্ হন্ করে শিবু এগিয়ে যায়। হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে একটা আড্ডা বসে রোজ! কিন্তু সেখানে সে পাত্তা পায় না।

সাধু ময়রার আড্ডা আর জমে না কেন ?

সাধু ময়রার দোকানই গেছে উঠে। কে কিনবে তার সে নোংরা গামলার ময়লা খাবার। দোকানে একটা কাঁচের আলমারি পর্য্যন্ত নেই। একটা পুরোণ, ঝুলে কালো, চিক্। তাই দিয়ে কি ধূলো আটকায়, না, আটকায় মাছি ?

সাধু ময়রা তবু যুঝেছিল বই-কি !

"কাঁচের আলমারি কিনব বই কি দাদা, কিন্‌ব। সাপের চর্ব্বি দিয়ে নিম্‌কি সিঙাড়া ভাজি আগে, তখন মোটা টাকায় কিনব কাঁচের আলমারি। আর খাবারে মাছি বসবেনা তখন।"

কিন্তু হাজার হলেও তার সাদা মন! বাঁকা কথাও তার মুখে অন্য রকম শোনায়! তার পরেই হেসে উঠেছে হো হো করে— "মাছি তখন অমনিই বসবে না দাদা! মাছিদেরও ঘেন্না পিত্তি আছে!"

কিন্তু তবু চল্‌ল না। সাধু মান খুইয়ে বুঝি তেলেভাজার ব্যবসাও সুরু করেছিল। কিন্তু সইল না।

একদিন ঝাঁপটাপ গুটিয়ে গরুর গাড়ীর ওপর ক্যানাস্তারা কড়াই চাপিয়ে সাধু দেখা গেল—যাবার উদ্যোগ করছে।

"কোথায় যাও দাদা ?"

"কোথায় আর যাব ভাই, পেসাদপুরে অত বড় গাজনের মেলা। ক'দিনের জন্যে একটু জায়গা বদলে আসি।"

কিন্তু পেটে কথা রাখা সাধু ময়রার ধাতে নেই। খানিক বাদে বলেই ফেলে কথাটা,—"চল্লুম ভাই। আসল কথা, দোকান পাট পোষাল না!"

"পোষাল না!" ভৈরব বেরা অবাক হয়ে বলে—"কেন তেলে ভাজা ত তোমার বেশ বিক্রী হচ্ছিল ভাই!"

"হোক্ বিক্রী! হাজার হোক জাত্ ময়রার বংশ, ও তেলের গন্ধ নাকে সয় না। দেশে গিয়ে আবার তার চেয়ে মোয়া মুড়কির দোকান দেব। এখানে আসাই হয়েছিল ঝকমারী!"

ভৈরব বেরার মনের কথাও তাই। এম্‌নি পাত্তাড়ি গুটিয়ে দেশের পানে পা বাড়াতে পারলে সে বেঁচে যায়। কিন্তু তার উপায় যে নেই। দোজ পক্ষের বৌ সহর ছেড়ে যেতে একান্ত নারাজ।

সে ধমক দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে, মিনতি করেছে, শেষ পর্য্যন্ত শুধু পায়ে ধরতে বুঝি বাকি রেখেছে কিন্তু বৌ-এর মন গলেনি।

"শুধু এই দুটো মাসের জন্যে না হয় চল্‌,"—বলেছিল ভৈরব, "ধানকাটার এই দুটো মাস,—তারপর আবার আসবি'খন্‌।"

বৌ-এর উল্টো কথা,—"কেন, আমি গিয়ে কি ধান কাটব নাকি!"

রাগে দুঃখে ভৈরবের বুঝি মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে।—মেয়ে মানুষের বেয়াড়া নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝি মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। ঘাড়ের ওপর এদের মানুষের মত মাথা গজাবার কি দরকার ছিল?

ভৈরব মাথা ঠাণ্ডা করে তবু বলবার চেষ্টা করেছে—"ধান কাটার সময় চুরি চামারি করে সব একসা করে দেবে। এ-সময় গিয়ে না দাঁড়ালে হয়! এ দুবছর কত লোকসান দিলাম বল দেখি!"

বৌএর সেই কথা—"তবে এসেছিলে কেন?"

ভৈরব হতাশ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের শরণ নিয়েছে—"ক'দিন ধরে ভাবছি, ধানের টাকাটা পেলে এবার না হয়—সেই 'ফারফোর্ট' তাগাই গড়াতে দেবে। কিন্তু নিজে না গেলে কি হবে! পাঁচ ভূতে লুটে নেবে!"

কিন্তু বৌ ছেলেমানুষ হলে কি হয়, লোহার চেয়ে শক্ত। বলেছে—"বেশ ত তুমি যাও না। দাদা রয়েছে, ঠাকুরঝি

রয়েছে, আর আমাদের জন্যে ভাবনা নেই। আমরা থাকব'খন যা হোক করে।"

মনে মনে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠে ভৈরব বলেছে—"বেশ! তাই—যাব।"

কিন্তু যাওয়া তার হয় নি। কেন হয়নি কে জানে!

কাটা কাপড়ের দোকান তার আর চলে না। অনেক আশায় হুজুকে পড়ে সহরে এসে দোকান ফেঁদেছিল। কিন্তু ঘর ভাড়াটাও তুলতে পারে নি আজ পর্য্যন্ত। দেশের জমিজমা সব উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। এখন গিয়ে না দেখলে একূল ওকূল ছুকূল তার যায়। কিন্তু তবু সে যেতে পারে না। দেনদারদের তাগাদায় অস্থির হয়ে প্রতিদিন সে বড় রকমের দিব্যি গেলে ঘরে যায়;—আজ সে বৌকে রাজি করাবেই। রাজি না হয় জোর করে নিয়ে যাবে টেনে। কেন, সে কি পুরুষ মানুষ নয়!

কিন্তু তার পর দিন আবার তাকে দেখা যায় শুকনো মুখে দোকানের খালি বাক্সটি কোলে করে বসে থাকতে।

খদ্দের ত নেই—আলাপ করবার একটা লোকও যদি থাকত। পুরোণ দলের এক এক করে অনেকেই গেছে খ'সে। শিবদাস গেছে অনেকদিন, তার পর একদিন সরে পড়েছে নফর, বাজারে বিস্তর দেনা রেখে।

এখনও চলে গেলে বুঝি ভৈরব সব দিক সামলাতে পারে। দেশে চারটে লাঙ্গলের জমি-জমা আছে, যাহোক একটা পাতার কুঁড়েও আছে মাথা গোঁজবার। নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে ত পারবে। কিন্তু উপায় নেই। বৌ সহরের কি স্বাদ পেয়েছে কে জানে! কল থেকে এখানে জল পড়ে। রাস্তায় ফিরিওয়ালা হেঁকে যায় দরজার পাশ দিয়ে। কে বলতে পারে কোন দিন—কি অদ্ভুত জিনিষ কি অসম্ভব জিনিষ কোন ফিরিওয়ালা এনে হাজির করবে। প্রত্যেক ফিরিওয়ালার হাঁকে বুক কেঁপে ওঠে আনন্দে। নতুন, অনাস্বাদিত বিস্ময় আছে প্রত্যেকের সওদায়।

না, বৌ সহর ছেড়ে যাবে না। সেও পারবে না যেতে। দেনায় আপাদমস্তক ডুবে, দুকূল হারিয়ে শুকনো মুখে সে প্রতিদিন এসে বসবে শূন্য দোকানে। এই তার নসীব।

সাধু ময়রাকে দেখে তাই তার ঈর্ষ্যা হয়। উৎসুক ভাবে ভৈরব তার যাবার আয়োজন দেখে। মুখে অবশ্য সে ধরা দেবার পাত্র নয়।

"একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয় দাদা, বীজ রুয়েই কি কাস্তে শানান চলে। আর দিন কতক সবুর করলে হত না?"

সাধু ময়রা হেসে বলে,—"না ভাই, আর সবুর করলে

গরুর গাড়ীতে চড়ে আর যেতে হত না, তোমাদের কাঁধেই যেতাম।”

এক গরুর গাড়ীতে উঠেছে সাধু ময়রার কিছু জিনিষপত্র আর ময়রা নিজে, বাকী মালপত্র নিয়ে পেছনে যায় আর এক গাড়ী।

ধীরে ধীরে গরুর গাড়ী এগিয়ে চলে। মানপোতার সাঁকোর ওপর দিয়ে নেমে যায় ওধারের মাঠে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভৈরব বেরা তবু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে অবসন্ন ভাবে। বিশেষ কিছু যে ভাবে—তা নয়। ভাববার আর তার ক্ষমতা নেই। সে ভয়ানক ক্লান্ত, সহরের সমস্ত কাঠ ও পাথরের বোঝা যেন তারই ওপর চেপে বসেছে। সে শুধু জিরোতে চায় একটু,—গভীর, সুদীর্ঘ বিশ্রাম, চায়—

সাধু ময়রা দোকান-পাট তুলেছে বটে, কিন্তু তাই বলে আড্ডা কি আর জমে না ? জমে বইকি ? সকাল সন্ধ্যে হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে জায়গা থাকে না দাঁড়াবার। রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর বেঞ্চি পাততে হয়। তাতেও কুলোয় কই ?

মজলিসে শিবু কি ভৈরব কেউ থই পায় না অবশ্য। এখানে অন্য রকমের ব্যাপার। নেশা ভাঙ চলে না। অন্তত জানাজানি ত হয় না। তাস পাশাও নেই।

সহর কি তাহলে এগুচ্ছে ! না তা নয় বোধ হয়। এ ধারের পাড় ভেঙে ওধারে পলি জমছে মাত্র। একটু চেহারার তফাৎ শুধু।

কি শীত কি গ্রীষ্ম সকলের চেয়ে আগে আসে বিশ্বনাথ। কিন্তু যত আগেই আসুক হরেকৃষ্ণকে হারাবার জো-টি নেই। তার ঘর ঝাঁট-পাট, পরিষ্কার, উনুন ধরানো সব হয়ে গেছে। বড় ডেক্‌চিতে জল পর্য্যন্ত ফুটছে।

"এস বিশুদা, এস ! রাত্রে ঘুম হ'ল কেমন ?"—হরেকৃষ্ণর এ চিরন্তন সম্ভাষণ।

বিশ্বনাথ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে—"কোথায় ঘুম ভাই! জেগে জেগে যে সবকটা ঘড়ি বাজা শুনলাম। ডাক্তারখানার ঘড়িটা আবার নতুন, আওয়াজ দেয় যেন জলতরঙ্গ বাজছে !"

লম্বা অপরিষ্কার দাড়ির ভেতর হাত বুলিয়ে বিশ্বনাথ একটু হেসে আবার বলে,—"ঘুম আর চিতেয় না শুলে হবে না।"

বিশ্বনাথের এ উত্তরও চিরন্তন। তার ঘুম নেই আজ অনেক দিন, দোকান করে অবধি হরেকৃষ্ণ তাই শুনে আসছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যেও নয়। রাঙা রাঙা পাগলাটে চোখ, শুকনো কোঁচকানো দাড়ি-ঢাকা মুখ, হাতের পায়ের নখগুলো যেমন বড় তেমনি ফাটা ফাটা, বেরঙা। দেখলে যেন জংলী বলে মনে হয়। কিন্তু বিশ্বনাথের বোধ হয় সঙ্গতি আছে কিছু। অন্ততঃ কাপড়-চোপড়ে তার খুঁৎ ধরবার কিছু নেই। একরকম ফিট্‌ফাটই বলা যেতে পারে। আর হরেকৃষ্ণর দোকানে সকাল থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত চা সে বড় কম খায় না, কিন্তু বাকী রেখেছে কেউ কখন বলতে পারে !

না বাকী সে রাখে না, এক রাতের জন্যেও নয়।

হরেকৃষ্ণই বরং নিজে থেকে বলেছে কোনদিন—"তোমার টাকার ভাঙানি এখন কোথায় পাই বাপু, রাত্রে! আমার

কাছেও সব নোট। কাল সকালেই না হয় দিও, কটা ঘণ্টা বইত নয়!"

বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছে,—"না হে না, তাহলে টাকাটাই না হয় রাখ। কাল সকাল এখন অনেক দূর। কত কি এর মধ্যে হ'তে পারে!"

হরেকৃষ্ণ একটু হেসে হয়ত বলেছে,—"তা যদি হয়ই ধর, ও কটা পয়সার জন্যে আমি মারা যাব না।"

"তুমি ত যাবে না ভাই, কিন্তু আমি মারা গিয়েও শান্তি পাব না। সামান্য দু-চার আনার জন্যে ওপারের দপ্তরে দাগী হয়ে থেকে লাভ কি! দশ বিশলাখ হয়, ত বুঝি।"

শেষ পর্য্যন্ত হরেকৃষ্ণকে টাকাটা রাখতেই হয়েছে।

তা, বিশ্বনাথ লোকটা একটু অদ্ভুত বটেই। তার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনাও বাদ যায় নি। কিন্তু বিশেষ কিছু কেউ বোধ হয় জানে না।

হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে তাকে দেখা যাচ্ছে আজ বছর দুএক—সেই দোকান খোলা ইস্তক। তার আগের খোঁজ কেউ রাখে না। কোথা থেকে সে এসেছে, কি যে তার কাজ, তাই বা কে জানে!

কাঠের গোলার পাশে ছোট একটা টিনের চালায় তার বাস। তিন কূলে বোধ হয় কেউ নেই। থাকে একলাই।

আর থাকেই বা কতক্ষণ! হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানেই কাটে তার বেশীর ভাগ সময়। কি করে যে তার চলে তা কেউ পারে না বলতে।

হরেকৃষ্ণ আড়ালে বলে,—"বিশুদার টাকা কড়ি কিছু পোঁতা আছে দেখো!"

কেউ বড় সে কথা বিশ্বাস করে না, বলে,—"পুঁতবে কোথায় হে? একে ভাড়াটে ঘর, তায় সিমেন্টের মেজে! আর টাকা পোঁতা থাকলে এখানে এসে অমন নিশ্চিন্দি হয়ে আড্ডা দিতে পারে রাত দিন! না হে না, আরো কিছু রহস্য আছে।"

কি যে রহস্য তা অবশ্য আজো আবিষ্কৃত হয় নি। আজো বিশ্বনাথ প্রতিদিন হরেকৃষ্ণর প্রথম তৈরী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে আসে ভোর বেলা। তার পর বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে প্রতীক্ষা করে থাকে খবরের কাগজের জন্যে।

হরেকৃষ্ণর খবরের কাগজের ভাগীদার কিন্তু আরো অনেক। তারা যথা সময়ে এসে হাজির হয়, বিশ্বনাথের দীর্ঘ প্রতীক্ষার মর্য্যাদাও দেয় না। আসতে না আসতে তারা ছেঁকে ধরে, ভাগাভাগি করে নেয়। বিশ্বনাথ সেই ভীড়ের পাশে টুকরো দু-চারটে উচ্ছিষ্ট খবরের আশায় ভিখিরীর মত বসে থাকে।

নারায়ণ এ মজলিসের মাতব্বর ব্যক্তি; বয়সে নয়, গলার জোরে। তার ধারালো জিভটাকে সবাই ভয় করে।

খবরের কাগজের আসল পাতাটা সেই হাতায় সবার আগে। আর সকলে বাকী কাগজগুলো পায়। কেউ বা উঁকি-ঝুকি মারে।

মেজাজ ভালো থাকলে নারায়ণ কাগজের শিরোনামাটা চেঁচিয়েই পড়ে—"চীনের প্রতি জাপানের হুম্‌কি! জাপ-বাহিনীর মুকদেন অধিকার!"

সবাই কাণ খাড়া করে থাকে।

নারায়ণ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে গর্ব্ব-ভরে বলে,—"কি হে, কি বলেছিলাম! এ বাবা কেউ কেট্রা নয়, জাপান। কাউকে পরোয়া করে না। সবাই ত খুব তড়পেছিল, এখন ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ল কেন!"

জাপানের জয়ে যে নারায়ণেরই কৃতিত্ব এটা বেশ ভাল রকমই বোঝা যায়। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর তর্জ্জনী তুলে শাসিয়ে নারায়ণ বলে,—"কারোর এখানে ট্যাঁ-ফো করবার জোটি নেই, কথা কয়েছ কি টুঁটিটি চেপে ধরেছি। যেমন ধরেছিলাম রুষের।"

আমেরিকা রাশিয়া ইংলণ্ড সভয়ে চুপ করে থাকে। কোন দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে খুশী হয়ে নারায়ণ আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করে।

বিশ্বনাথ কুণ্ঠিত ভাবে একবার জিজ্ঞাসা করে,—"সেই মামলার খবর-টবর কিছু আছে নাকি?"

নারায়ণ কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে,—"আরে রেখে দাও তোমার ছেঁড়া মামলার খবর! খবরের কাগজের জায়গার দাম আছে, রোজ রোজ তোমার ওই বাজে খবর তারা ছাপে না!"

বিশ্বনাথ অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু তার ধৈর্য্যের অন্ত নেই। সকলের পড়া আলোচনা আলাপ তর্ক বিতর্ক শেষ হবার পর কাগজটি একবার নিজে হাতে নেবার জন্যে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

তার বসে থাকার মানেও বোঝা যায় না। দু'পয়সার একটা কাগজ সে ত নিজেই কিনতে পারে! তবু সে সব অবহেলা লাঞ্ছনা সহ্য করে বসে থাকে কেন? হয়ত মামলার খবর তার ছুতো মাত্র, হয়ত মানুষের সঙ্গই তার একান্ত প্রয়োজন—সে সঙ্গ যেমনই হোক।

কিন্তু তার চোখের তারা লাল। সারারাত সে ঘুমোতে পারে না। সেও কি এই নিঃসঙ্গতার ভয়ে?

হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে শুধু সাম্রাজ্যের উত্থান পতনই হয় না। ছোট খাট ব্যাপারও আলোচনা হয় বই কি—ছোট খাট ঘরোয়া ব্যাপার। সহরের ছোট খাট ঘটনা।

"আবার একটা ডাক্তারখানা খুলল যে হে!"

"আবার ডাক্তারখানা! কেন হে, সহরে মড়ক লেগেছে নাকি!"

"মড়ক না লাগলে বুঝি ডাক্তার আসতে নেই। সহরে লোক কত বেড়েছে বল দেখি! একা বিভূতি ডাক্তার সামলাতে পারে!"

"হুঁঃ, সামলাতে পারে না, তাই বুঝি গাড়ি ঘোড়া বেচে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে হেঁটে রুগী দেখে বেড়ায়!"

"তা ঠিক বটে! ডাক্তার ত আছে, কিন্তু ডাকবে কে? পয়সা আছে সহরে?"

"পয়সা থাকলে আর ট্রামের লাইন পাততে এসে কোম্পানি পেছিয়ে যায়। ওরা ত আর কাঁচা ব্যবসাদার নয়। সহর সাজাবার জন্যে ত আর খালি পেটে গাড়ি চালাবে না!"

"পয়সা নেই পয়সা নেই, বোলো না। আমার নেই তোমার নেই, যার আছে তার দেখতে যাও সিন্ধুকে কুলোয় না। নন্দ মুদির দোকানটা কেমন জ াঁকিয়েছে দেখেছ!"

কথাটা সত্যি। এই অনটনের বাজারে নন্দ মুদিই ফেঁপে উঠেছে। কেমন করে ফেঁপে উঠেছে কে জানে!

দরমার ঝাঁপ তোলা নন্দর সে পুরোনো মুদিখানার কথা আর কে ভুলেছে! নন্দ তখনও বিলিতি জুতো মশমশিয়ে দোকানে আসত বটে—কিন্তু পলায় মেপে দু'পয়সার তেলও বেচেছে। আর এখন? এখনও দু'পয়সার তেল পেতে পারো বটে নন্দর দোকানে। কিন্তু চাইতে পারবে না! মুদির দোকানের এমন জাঁকজমক, এমন আদব-কায়দা আবার কবে কে কোথায় দেখেছে!

কত মণ না জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা করতে হবে সেরের দর! নন্দ নিজে অবশ্য দোকানে বসে না, কিন্তু তার ভাইপো গোবিন্দ ত আছে। সে তোমার মর্য্যাদা বোঝে, তার চাউনি দেখেই তা বোঝা যায়। সে জানে তোমার মত লোক সামান্য দু'পয়সার তেল কখন নিতে আসতে পারে না।

টিন থেকে হাতল বাঁধা মগে সে তেলটা তুলে দেখায়। হেলায়-ফেলায় সেটা আবার ঢালতে ঢালতে মৃদু হেসে বলে—"ভালো তেল সবাই চেনে কি!"

তুমি যে চেন তা গোবিন্দ জানে। তুমি আর সহরের দু'একজন।

"ডাক্তার বাবুর বাড়ি এইমাত্র পাঠালাম এক টিন।"—গোবিন্দ বলে, "আমাদের নতুন ডাক্তার বাবু। উনিও ভারী খুঁৎখুঁতে! একেবারে খাঁটি জিনিষটি চাই।"

নন্দর দোকানের সত্যি বড় বড় খদ্দের। আর শুধু মুদিখানা ত নয়, মনিহারির দোকানও আছে সঙ্গে। রেলের লাইনের ওপারে সাহেব পাড়া থেকে সেখানে খদ্দের আসে। সাহেব মেমেরা নিজেরা আসে, গাড়িতে।

নন্দ অবশ্য নিজে আজকাল বসে না। তার দোকানে বসবার ফুরসুৎ কোথায়! শুধু ত দোকান নয়! তার অনেক কাজ কারবার। দেখতে দেখতে সে কি অমনি ফেঁপে উঠেছে!

তেজারতিতে তার অমন কত টাকা খাটছে; আর তাছাড়া পুরোনো সহরে আরও কিছু তার আছে!

নন্দ বিলিতি জুতো মশমশিয়ে রোজ পুরোনো সহরের দিকে ত হাওয়া খেতে যায় না!

না, নন্দ মুদিকে করিতকর্ম্মা লোক বলতেই হবে। সেই নন্দ, বিলিতি জুতো মশমশিয়ে যে যেতো কখন কখন সাধু ময়রার আড্ডায়—তারই মাথায় এত বুদ্ধি খেলত কে জেনেছিল? এখনই নন্দকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে!

নন্দ নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না। কোথায় তার নিজের মনে একটা খট্‌কা আছে, সে নিজেই বুঝি একটু হতবুদ্ধি হয়ে আছে—নিজের এই পয়ে। এ যেন একটা ভোজবাজি।

অনেক রাতে দু' দোকানের হিসেব সরকারের কাছে ভাল করে বুঝে নিয়ে নন্দ নিজের ঘরে শুতে যায়। চাকর এসে মশারি ফেলে ফ্যান চালিয়ে আলবোলার নলটি মশারির ভেতর দিয়ে হাতে তুলে দেয়।

"আলো নিভিয়ে দেব বাবু?"

নন্দর সাড়া পাওয়া যায় না। চাকর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সুইচ্ টিপে চলে যায়।

না, নন্দ ঘুমিয়ে পড়েনি। অন্ধকারের ভেতর মৃদু তামাক খাবার আওয়াজ পাওয়া যায় থেকে থেকে। নন্দ ঘুমোয় নি। নন্দ ব্যবসার চিন্তাতেও মগ্ন নয়। ব্যবসার জন্যে তাকে চিন্তা করতে হয় না। নন্দ ভাবছে অবাক হয়ে—তার সৌভাগ্যের কথা! নিজের সৌভাগ্যে সে-ই সব চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। ধুলো মুঠো তার সোনা মুঠো হয়ে উঠেছে কিসের ভেল্কিতে? সে নিজেই কি বোঝে—!

সব যেন সেই আলাদিনের প্রদীপের গল্প। তার ব্যবসা-বুদ্ধির সুনামের অন্ত নেই। নানান লোক তার পরামর্শ নিতে

আসে—নানা বিষয়ে। নন্দ পরামর্শ দেয় আর অবাক হয়ে যায় তার পর্ব্বতপ্রমাণ অজ্ঞতায়, অবাক হয়ে যায় লোকের অন্ধ বিশ্বাসে।

ব্যবসা-বুদ্ধির সে কি ধার ধারে! তার ধুলো মুঠো যাদুতে সোনা হয়ে গেছে। মাগ্‌গির বাজারে সে আহাম্মুকের মত চড়া দামে চাল কিনে বসেছে এক নৌকো, দালালের খোসামোদে ভুলে। যারা জানে শোনে, সবাই ছি ছি করেছে। আফশোষে তার নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করেছে।

কিন্তু তারপর? তারপর সবাইকে থ’ করে হঠাৎ কি যাদুতে চালের দর আরো গেছে চড়ে। চালের নৌকো তার সোনার নৌকো হয়ে উঠেছে। সবাই তার দূরদৃষ্টির তারিফ করেছে।

বলেছে “ভালো মানুষটির মত থাকে,—ও নন্দ কম ধড়িবাজ নয়!”

তাই, তাই হয়ত হবে! হয়ত নন্দ অনেক কিছু বোঝে। কিন্তু নন্দ জানে, সেবারে চাটুজ্যেদের পোড়ো বাড়িটা বন্ধক রেখে সে একেবারে আনাড়ির মত এক গাদা টাকা ধার দিয়ে বসেছিল। সবাই বলেছিল—“করলে কি হে, বাড়িটা বেচলে যে ওর অর্দ্ধেক উঠবে না। একেবারে ডাহা ঠকিয়ে গেল, ওরা তোমায়?”

তারা মিথ্যে বলেনি। চাটুজ্যেদের ঋণ শোধ হ'ল না। আরো গুনগার দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাকে কিনেই নিতে হ'ল। তখন নন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। কিন্তু আবার হ'ল ভেল্কিবাজি! সহরের বড় কর্ত্তারা হঠাৎ কি খেয়ালে নতুন তুটো রাস্তা বার করে দিলেন। রাস্তার মাঝে হঠাৎ শোনা গেল পার্ক তৈরী হবে। নন্দর বাড়িটার জন্যে পার্কটা ত আর বেখাপ্পা বেঢপ হয়ে থাকতে পারে না! নন্দর বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল, লাভের পরিমাণ দেখে নন্দ নিজে অবাক।

নন্দ নাকি শোনা গেল গভীর জলের মাছ। সব সে আগেই আঁচ করে রেখেছিল

আর নন্দর দোকান? হ্যাঁ, সেখানেও তার জয়-জয়কার। ভাইপোটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে কেমন তালিম করে তুলেছে। যেমন গুরু তেমনি সাকরেদ!

গোবিন্দ উপযুক্ত সাকরেদই বটে। একদিন এসে হয়ত বলে, "আটা ময়দার অর্ডারটা খারিজ করে দাও কাকা!"

নন্দ অবাক হয়ে বলে—"কেনরে?"

"দর মনে হচ্ছে আরো নেমে যাবে। বাইরের রপ্তানি এবছরের মত খতম। ও বায়নার টাকা কটা গচ্চা যায় যাক।"

নন্দ গম্ভীর হয়ে বলে—"আমিও তাই ভাবছিলুম।"

তারপর গমের বাজার সত্যি যায় নেমে। চড়া দামে যারা

গুদাম ভর্ত্তি করেছিল তারা লোকসান দিয়ে ফতুর হয়ে যায় নন্দ মুদির বড় গোছের লোকসান বেঁচে যায় তার গভীর ব্যবসা-বুদ্ধির জোরে!

তার গভীর ব্যবসা-বুদ্ধি! দেখে শুনে নন্দ যদি নিজে একটু হতভম্ব হয়ে থাকে, যদি মাঝ রাতে বিস্ময়ে, ভয়ে, তার ঘুম না আসতে চায়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

নন্দ সত্যি থই পায় না। টাকার ওপর টাকা এসে জমছে, বর্ষাকালের নদীতে চারিধারের মাঠের জলস্রোতের মত। কেবলই নদী চলেছে বেড়ে ফুলে ফেঁপে; বইছে বিপুল বেগে। নন্দকে সে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে অসহায় ভাবে।

সম্পদেও মানুষ অসহায় হতে পারে, সম্পদের অপ্রত্যাশিত বন্যায়।

কি করবে নন্দ ভেবে পায় না। কি করবে এত টাকা দিয়ে। তার জীবনে এত টাকার কথা সে কল্পনা করে নি। টাকা নিয়ে অনেক কিছু ত করা যায়। কিন্তু অনেক কিছুই যেন ফুরিয়ে আসছে। চীনে বাড়ির বদলে বিলিতি জুতো পরা যায় বটে। কিন্তু জুতো যখন পায়ে সয় না! পা টন্‌টন্‌ করে! কড়ার যন্ত্রণায় সমস্ত পা টাটায়! শুধু পায়ে একবার ধুলোমাখা রাস্তায় হাঁটতে পারলে প্রাণভরে, সে যায় বেঁচে!

নন্দ মুদির সমস্ত প্রাণও যেন টাটিয়ে উঠেছে বলে তার এক

এক সময় সন্দেহ হয়। কিন্তু সে তা স্বীকার করতে চায় না সহজে। চীনে বাড়ির বদলে সে বিলিতি জুতো পরে। কে জানে হয়ত একটা ছোটখাট মোটরও কিনতে পারে তাড়াতাড়ি! কিন্তু তবু অনেক পয়সা থেকে যাবে। হয়ত আরো বেড়ে যাবে। সে পয়সা কাউকে দেবার নেই। সে পয়সায় কিছু করবার নেই!

নিজের কেউ না থাক, তার ভাইপো ভাইয়েরা ত আছে! কিন্তু প্রাণের কথা যদি জানতে চাও, তাদের দিয়ে নন্দর তৃপ্তি নেই। তারা বড় বেশী আশা করে আছে। তারা যেন বড় বেশী নিশ্চিন্ত। তারা পেয়ে অবাক হবে না। তারা আগে থেকে জানে।

তাদের তাই চম্‌কে দিতে পারলেই যেন নন্দর সুখ হয়—। একেবারে তারা যাতে আকাশ থেকে পড়ে। নন্দর বোধ হয় ওইটুকু-ই কল্পনার বিলাস।

নন্দ কি একেবারে কিছু ভাবে নি? তা ভেবেছে বই কি!

তার পুরোনো মুদির দোকানের পাশে ছিল ছোট ইটের একটুখানি মন্দির! কে গড়েছিল কে জানে! আসতে যেতে নন্দ একবার করে তখন প্রণাম করেছে। লম্বা জটামাথায় বুড়ো সেবায়েৎ কোন দিন দুটো বেলপাতা হাতে দিয়ে বলেছে—"নিয়ে যা বেটা। তোর প্রতি বাবার অনেক্ দয়া!"

সে ইটের মন্দিরের চূড়ো দেখতে দেখতে পাশের তেতালা ছাড়িয়ে উঠেছে! আজ তার পেতলের চূড়ো রোদে সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করে। ভেতরে পঙ্কের কাজ। বাবার মাথায় ক'সের দুধ পড়ে, তাই নিয়ে ভক্তদের ভেতর বাধে তুমুল তর্ক।

নির্জীব সহরতলিতে মন্দির বাড়ছে কিসের জোরে? হয়ত দেবতার নিজের ইচ্ছায়।

এখনো আসতে যেতে নন্দ একবার কপালে হাত ঠেকায়। বুড়ো সেবায়েৎ ডেকে নিজের হাতে কপালে দেয় ফোঁটা।

বুড়ো সেবায়েৎ আবার কোনো সময় নিরিবিলি পেয়ে বলে,—"মনে থাকে যেন কথাটা!"

কথাটা আর কিছু নয়। বাবা ঘেঞ্জি সইতে পারছেন না। তাঁর হাঁফ ধরে আসছে। মন্দিরের দু'পাশে পুরোনো আমলের টিনের চাল দেওয়া ক'টা দোকান। কোনটায় বাসন মেরামত হয়, কোনটায় হিন্দুস্থানী দোকানী ছোলাভাজা, ছাতু বিক্রী করে। ঘোষেদের জমিটার উন্নতি হ'ল না। বাবা এই জমিতে হাত পা ছড়াতে চান একটু।

হবে, হবে! নন্দ মুদির রাতে সহজে ঘুম আসতে চায় না। মোটর কিনেও তার পয়সা ফুরোবে না। তার প্রতি বাবার অনুগ্রহের আর সীমা নেই। বাবার হাত পা ছড়াবার জায়গা সে করে দেবে বই কি।

হয়ত সে আরো কিছু দেবে। এইখানেই নন্দর জীবনের একমাত্র আনন্দ। হয়ত ভাই, ভাইপোরা হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে পড়বে।

টীনের চালা ইটের দেয়াল গিয়ে পাকা দোতালা উঠেছিল। তারপরে আর কিছু হয় নি।

এখনো সেই দোতালাই আছে। এ অঞ্চলে বড় বাড়ি দু'চারটে নেই এমন নয়। কিন্তু বিপিনবাবুর বাড়ি, তার মধ্যে নয়।

বিপিনবাবুরা কি তাহলে পেছনে পড়ে গেছেন? হয়ত তাই। লোকে কথায় কথায় আর শুক্‌নির নাম করে না। শুক্‌নিকে যারা জানত তারা আর সহরে আছে ক'জন? তারা কেন বলা যায় না সহরে টিঁকতে পারল না। ধীরে ধীরে তারা হটে গেছে, তলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে তাদের সব কিছুই তারা নিয়ে গেছে,— সব বিস্ময়, সব গল্প গুজব।

সহরের রাস্তায় এখনো হয়ত মাঝ রাতে কেউ ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তা নিয়ে কেউ ভয় পায় না। তা নিয়ে কেউ গল্প ফাঁদে না। সহর এখন বুঝি গা-সওয়া ব্যাপার। খানিকটা জানা শোনা, একঘেয়ে ব্যাপার।

আগামী কাল

তবু দু'চারটে ঘটনা আলোচনার মত ঘটে বইকি এখনো। তা নিয়ে গল্পও জমে, কিন্তু তেমন যেন রঙ নেই সে সব আলোচনায়।

সহর এখন অনেকটা একঘেয়ে ব্যাপার! সহরেরই এখন জৌলস নেই। ক'বছরের বর্ষায় সুবোধবাবুদের বাড়িতে শ্যাওলার মোটা ছোপ ধরেছে। সহরের রাস্তায় ধুলো আর জঞ্জাল, আর পুরোনো বাড়ির দেওয়ালে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের কাগজ ওড়ে। রঙদার কি গুজব এখানে চলবে?

শুক্‌নি হাজার হ'লেও বড় রঙদার নাম। ও নাম এখন আর বড় কারুর মনে নেই। হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে যারা আড্ডা জমায় তারা ও নাম জানে না বল্লেই হয়। তারা ওরকম নাম বানায়ও না। ও সব তাদের আসে না। সহর তাদের গা-সওয়া ব্যাপার।

তারাও আলোচনা করে বটে অনেক কিছু। তর্ক করে অনেক কিছু নিয়ে। সহরে নতুন একজন ডাক্তার এসেছে। ছোট খাট নয়, বড় গোছেরই হবে। দরজায় তার পেতলের সাইন-বোর্ড মারা। নামের পেছনে অনেকগুলো অক্ষর। ডাক্তার নিজের মোটরে টহল দিয়ে বেড়ায়। বিভূতি ডাক্তারের মত গাড়ি ঘোড়া বেচে দিয়ে পায়ে হেঁটে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে ফেরে না।

সহরে ত টাকা নেই ডাক্তার ডাকবে কে ?

না সে সমস্থার মীমাংসা হয়ে গেছে। অমল ডাক্তার সহর-তলির কলের জন্যে থোড়াই কেয়ার করে। সে ব্যাঙের মুখ চেয়ে পুকুর কাটে নি। তার আসল পসার পুরোনো সহরে—যেখানে বড় বড় ইমারতের পেছনে দিন দুপুরে সূর্য্য অস্ত যায়।

তবে এমন যায়গায় আসা কেন ?

তা'রো মীমাংসা হয়ে গেছে। বড় ঘেঞ্জি পুরোনো সহর বড় ঘেঞ্জি। ডাক্তার মানুষ তাই একটু ফাঁকায় থাকতে চায়। না, কারুর পসার নষ্ট করবার, কারুর পসারে ভাগ বসাবার ইচ্ছে নেই। তার নিজের কাজ সেরেই খাবার ঘুমোবার তার ফুরসৎ থাকে না।

অমল ডাক্তার এ অঞ্চলে এসে সকলকে বাধিত যে করেছে এটা মানতেই হয়। এ অঞ্চলের গৌরবও যে বেড়েছে এটা ঠিক।

লোকটা কিন্তু অমায়িক। পুরোনো সহরের কলের জন্যে তার ফুরসৎ না থাকলেও মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতেও দেখতে পাওয়া যায়। সুবোধবাবু একদিন ত পেয়েছিলেন।

"আমি এই মাত্র বেরুচ্ছিলাম !"

সুবোধবাবু কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন, "তবে এখন থাক, আমি অন্য সময়ে..."

"না, না, তা কি হয়। অমন কথা বলবেন না। হাজার

হলেও আপনি প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যই সবার আগে। বাইরের 'কলে' যদি তুচার মিনিট দেরীই হয় তাতেই বা কি! দেরী করলে 'কল'ত কেউ কেড়ে নেবে না।”

তারপর একটু হেসে,—“চেষ্টা করলেও বোধ হয় পারবে না। আপনার—”

“আমার এই অম্বলের ব্যথাটা—” স্থবোধবাবু তারপর সবিস্তারে তাঁর ব্যাধির কাহিনী বলেছিলেন।

সত্যি অমল ডাক্তার অত্যন্ত অমায়িক। বাইরের 'কল' তু'চার মিনিটের জায়গায় পোনের মিনিট উপেক্ষা করে ধৈর্য্য ধরে সমস্ত শুনেছিল। বলেছিল তারপর একটু হেসে—“চিকিৎসা ত করিয়েছেন একটু-আধটু!”

একটু কুণ্ঠিত হয়ে স্থবোধবাবু অপরাধ স্বীকার করেছেন,—“বিভূতিবাবুই এতদিন দেখছিলেন। উনি বলেন···”

অমল ডাক্তার একটু হেসেছিল—“উনি ত বেশ ভাল ডাক্তার শুনেছি। এ অঞ্চলে ওঁরই ত পসার।”

স্থবোধবাবু আরো লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন,—“কি করবে বলুন। আর কেউ ত নেই। দায়ে পড়ে ডাকতে হয়!”

“না, না, তা বলবেন না। অনেক দিন প্র্যাক্‌টিশ করছেন। অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে বই কি। তবে কি জানেন···”

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই হঠাৎ একটা কাগজ টেনে নিয়ে অমল ডাক্তার আবার বলেছিল—"হাঁ আপনার ওষুধটা !"

দ্রুত হাতে প্রেস্‌কৃপশন্ লেখা সাঙ্গ করে সেটা সুবোধ-বাবুর হাতে দিয়ে বলেছিল—"দিন কতক এইটে ব্যবহার করুন। ক'দিন পরে আবার খবর দেবেন।"

অমল ডাক্তারের সময়ের অভাব এইবার বোঝা গেছল।

সুবোধবাবু সামান্য কিছু ফী ধরে দিতে গেছলেন বুঝি। একটু হেসে সেটা সুবোধবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে অমল ডাক্তার বলেছিল—"ওটা রাখুন। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বাড়িতে ফী আমি নিই না।"

তারপর একটু গম্ভীর ভাবে—"তা ছাড়া আমার ফী আপনারা দিতে পারবেন না।"

অমল ডাক্তার এবার দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেছল। তার জরুরী কলের কত দেরী হয়ে গেছে কে জানে।

হ্যাঁ ডাক্তার বটে অমলবাবু, যেমন গুণী, তেমনি অমায়িক!

সুবোধবাবুর পর আরও কয়েকজন দেখা করতে গেছে। ফুরসৎ তার বেশী না থাকলেও অমল ডাক্তারকে বাড়িতে তারা সৌভাগ্যবশতঃ পেয়েছে!

প্রতিবেশীদের প্রতি অমল ডাক্তারের অসীম অনুগ্রহ।

হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে ডাক্তারবাবুর কথা উঠতে বসতে ওঠে, শুকনির নাম কিন্তু তারা অনেকে জানে না। সে নাম হারিয়ে গেছে কি ? হয়ত সে নামের আর যাদু নেই। তার পেছনে আর নেই কোন জোর ! সে নাম আর শোনা যায় না তাই।

অমল ডাক্তারও সে নাম শোনেনি। শোনবার তার সুযোগ কোথায়, আর দরকার কি ? সহর-সীমান্তে তার প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে পুরোনো সহরের 'কল' ছেড়েও তাকে প্রতিবেশীদের দিকে একটু-আধটু দৃষ্টি দিতে হয়।

হাজার হলেও প্রতিবেশীদের প্রতি কর্ত্তব্য ত সবার আগে। অমল ডাক্তার সে কথা অস্বীকার করবে কেমন করে ? সে কথা সে ত নিজেই বলে যখন তখন।

প্রতিবেশীদের প্রতি অমল ডাক্তার ভাল করেই নজর দেয়। নানা ব্যাপারেই দেয়। ডাক্তার হিসেবে তার দায়িত্ব সে ভুলবে কেমন করে ?

সম্প্রতি শুকনির বাজারের ওপরে তার দৃষ্টি পড়েছে। পড়েছে ঘটনা-চক্রে। অমল ডাক্তার নিজের অঞ্চলটাকে বুঝি দুরস্ত করে নিতে চায়। ডাক্তার হঠাৎ মোটর থেকে নেমে একদিন ঢুকেছিল বাজারে।

"কি বাজার বল্লেন ?"

সুবোধবাবু বুঝি সঙ্গে ছিলেন। হ্যাঁ ডাক্তারের সঙ্গে একরকম তাঁর বন্ধুত্বই হয়েছে বলা যেতে পারে। সুবোধবাবুর মুখে ত প্রায় সে কথা শোনা যায়—"ওঃ কাল বিকেলে? কাল বিকেলে ত ছিলেম ডাক্তারের সঙ্গে! ছাড়তে চান না ভাই, বলেন,—আমরাও মানুষ হে, শুধু ডাক্তারীর পুঁথি নয় এক গাদা। মনের কথা বলবার লোক না হলে আমাদেরও চলে না।"

সুবোধবাবুই বাজারের নাম বলেছিলেন।

অমল ডাক্তার বলেছিল ইংরিজিতে—"ভারী মজার নাম ত!" তারপর ভেতরে ঢুকে বলেছিল—"ঈস্! নাম সার্থক যে মশাই! শুকনির বাজারই বটে! ঢুকতেই যে গা বিড়িয়ে উঠেছে, সওদা করলে না জানি কি হবে!"

সুবোধবাবু নিজের গা বিড়িয়ে না ওঠার জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন।

অমল ডাক্তার বলেছিল,—"এ যে রোগের ডিপো মশাই! ছি, ছি, এমন নোংরা পাড়ায় মহামারী কেন লাগেনি এতদিন তাই ভাবছি!"

সুবোধবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন,—"এদিকে ত আর বাজার নেই কিনা!"

"না থাকুক! এখানে তা বলে বাজার করতে আসা যায়!

আপনারা এতদিন সহ্য করেছেন কি বলে। প্রাইভেট বাজার বুঝি! ব্যাপারীদের কাছ থেকে তোলা নিয়েই খালাস। জায়গাটা পরিষ্কার রাখবারও দায় নেই। না, মশাই, এর প্রতিকার দরকার। এ বাজার যে সমস্ত অঞ্চলটার কলঙ্ক, আমাদের কলঙ্ক। এখানে একটা সরকারী বাজারই বা বসবে না কেন? বাজে লোকের ট্যাঁক ভারী করবার আমাদের কি গরজ? না, আজই আমি এ সম্বন্ধে লিখছি করপোরেশনকে!"

সুবোধবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন,—"দেখুন মশাই যদি কিছু করতে পারেন। আমাদের মত লোকের কথা ত সহরের বড় কর্ত্তারা গায়ে মাখেন না!"

না, অমল ডাক্তার শুক্‌নির নাম শোনে নি। শুক্‌নির বাজার তার কাছে একটা সাধারণ আখ্যা মাত্র। শুক্‌নির নাম শোনবার সত্যি তার কি দরকার। সহর-সীমান্তে সে এখন একটা মাতব্বর ব্যক্তি—দশজনের একজন। সে অনেক কিছু ক্ষমতা রাখে। পুরোনো সহরেও তার প্রতিপত্তি বড় কম নয়। সে ইচ্ছে করলে নতুন একটা বাজার বসাতে পারে। এবং সে ইচ্ছেও তার আছে।

শুক্‌নির বাজার এবার বোধ হয় উঠ্‌ল। অমল ডাক্তারের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে; দাঁড়ালে পারবেই বা কেন? আর

শুক্‌নির ক্ষমতাই বা কতটুকু ? তার নামই ত সহরের লোক জানে না।

“রীতিমত ডাক্তারের স্থপারভিসনে থাকবে! বুঝেছেন! বাসি পচা, যা খুশী দিয়ে খদ্দেরের সর্ব্বনাশ আর করা চলবে না।”

স্থবোধবাবু সায় দিয়ে বলেছেন—“তেমনি ভালো ডাক্তারের হাতেও ভার দেওয়া দরকার। নইলে ঘুষের জোরে আবার সবই চলবে।”

অমল ডাক্তার একটু হেসেছে। কে জানে হয়ত প্রতিবেশী-দের জন্য অমল ডাক্তার এটুকু স্বার্থত্যাগেও রাজি হতে পারে! মুনাফা হয়ত নেই। কিন্তু ছুনিয়ার সব কাজেই মুনাফা খুঁজলে চলে না। যাদের পাড়ায় ঘর বাঁধতে হয়েছে তাদের একটু আধটু উপকারও করতে হয় বইকি ?

হরেকৃষ্ণর চায়ের আড্ডাতেও এ খবর কেমন করে পৌঁছে গেছে। নতুন সরকারী বাজার বসবে নাকি শীগ্‌গীর।

অমল ডাক্তার বাজারের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যেমন তেমন বাজার হবে না। সাহেব পাড়ার মত তক্‌তক্ করবে তার মেঝে আর দেয়াল! নোংরা কাপড়ে চাষা-ভুষোর শাক মাছ বেচা আর সেখানে চলবে না। তোলা নিয়ে মালিকের ট্যাঁক ভারী হবে না।

অমল ডাক্তার সত্যি এ অঞ্চলের পক্ষে যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ। শুধু ডাক্তারী কেন, কোন্ কাজে সে নেই? যেন ছুটোর জায়গায় দশ হাতে সে কাজ করে। সব দিকে সে আছে। কিছুতে কাউকে 'না' বলতে সে জানে না। দশের কাজে তার আলস্য নেই একটু। আর চৌকোস লোক ও বটে।

"ছেলেদের স্কুলের প্রাইজের দিনে তার বক্তৃতাটা শুনেছিলে।"

"শুনিনি আবার?"

"কি রকম চোস্ত ইংরিজি বল্লে! মুখ দিয়ে যেন খই ফুট্‌ল। একবার আটকাল না।"

"হবে না! কত মুলুক ঘুরে এসেছে!"

নারায়ণ মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে—"এবার সহরে ট্রামও আসবে!"

"ট্রাম?"—সবাই অবিশ্বাসের সুরে উচ্চারণ করে।

না, এটা বোধ হয় নারায়ণের বাড়িয়ে বলা। ট্রাম এলে আগেই আসত। কোম্পানী লাইন পাততে এসে আবার পিছিয়ে যেত না।

"হ্যাঁ, ট্রামই আসবে। অমল ডাক্তার কি অমনি ছাড়বে ভেবেছ! ওর কলমের জোর ত জান না, বিলেত পর্য্যন্ত খুঁচিয়ে তুলতে পারে!"

হয়ত তাই সত্য। ট্রাম হয়ত আসবে এবার।

কিন্তু যাই হোক নতুন বাজার আর বসে না। শুকনির বাজারেই বাসি পচা জিনিষ সবাইকে নোংরা চাষা-ভুষো মেছুনীর কাছে কিনতে হয়।

আর অমল ডাক্তার তার সাইনবোর্ডটা আবার বদলে ফেলে। এবার সাদা পাথরের ওপর কালো অক্ষর। পেছনের ল্যাজটুকু আর নেই।

অমল ডাক্তারের এখন অগাধ পসার। ও ক'টা বিদেশী-পদবীর অক্ষরে আর ওর বোধ হয় দরকার নেই। চেনা বামুনের আবার পৈতে কেন?

নির্জীব সহর-সীমান্ত! মরা নদীর স্রোতের মত, বইছে কিনা বোঝা যায় না।

সারাদিন একটু ধূলিম্লান কোলাহল ওঠে আকাশে, সারা-রাত্রি মিট্ মিট্ করে জ্বলে রাস্তার বাতিগুলি।

কিন্তু তবু চাঁদ ত ওঠে এ নগরের ওপর। দক্ষিণ সাগর থেকে হাওয়া আসে সুবোধবাবুদের টিনের ছাদের ওপর দিয়ে, নারকেল গাছের দীর্ঘ পাতা দুলিয়ে।

তার কি কোন চিহ্ন নেই এ নগরে? শুধু চলে বেচা-কেনা, আর ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্র আর দুর্ব্বল আড়ম্বর!

টিনের চালা গিয়ে যে দোতালা উঠেছিল তাতে দেখা গেছল একটি বয়ঃসন্ধিগতা বন্য হরিণীর মত চঞ্চল কিশোরীকে। আর দেখা গেছল একটি কৃশ ছেলেকে,—পাৎলা তার দীর্ঘ চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে। সে চোখ নীল বুঝি আকাশের স্বপ্নে। ফ্যাকাসে মুখে তার ম্লান একটু হাসি।

মনে হয়েছিল এখানে বুঝি কিছু পাওয়া যাবে—নগর-ক্লান্ত মনকে জুড়োবার মত! হয়ত জানা যাবে এ নগরের ওপরও চাঁদ ওঠে! এ নগর-শিখরের ওপর যে হাওয়া বয় সে হাওয়া যে অকূল সাগর থেকে আসে তা মনে পড়বে।

কিন্তু কোথায়?

ছেলেটির চোখ নীল কিন্তু আকাশের স্বপ্নে হয়ত নয়। ইটের ছাদের তলায় বাস করে সে হয়ত আকাশের কথা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে অকূল সাগর আছে কোথাও নগর থেকে বহু দূরে। সহরের পথ-ঘাট সে জেনেছে, জেনেছে সীমা, বন্ধন, শাসন। আর সব সে ভুলে গেছে।

আর সেই কিশোরী মেয়েটি! সে পার হয়ে এসেছে যৌবনে কিন্তু শুধু পার হয়ে এসেছে, কিছুই আবিষ্কার করেনি,—নিজেকেও নয়।

দুর্ব্বল ভাবে তারা একটু প্রেমের স্বাদ পাবার চেষ্টা করেছে, অকূল সমুদ্রের পানে হাত বাড়িয়েছে ভীতভাবে। তাদের সে প্রয়াস, ভীরুতায় বুঝি একটু কুৎসিৎই।

লীলার সে চঞ্চলতা ধীরে ধীরে এসেছে মিলিয়ে,—যৌবনের গভীর পরিপূর্ণতায় নয়, কেমন একটু অস্বাভাবিক আড়ষ্টতায়। হঠাৎ যেন সে কোথায় ধরা পড়ে গেছে। ধরা পড়ে গেছে বুঝি নির্জীব নগরের পঙ্গু দেবতার কাছে—যে দেবতা পাখীর ডানা

দেয় ভেঙ্গে আর মৃত্তিকাকে করে বন্ধ্যা, প্রাচীর তুলে যে দেবতা দিগন্তকে অস্বীকার করে। ধরা পড়ে হঠাৎ লীলা গেছে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে। প্রাণের এত উচ্ছলতা এ দেবতা প্রসন্ন চোখে দেখেন না। আর এ দেবতাকে প্রসন্ন করতেই হবে।

লীলা আজকাল দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে না। বাইরের ঘরে একটি রোগাটে ছেলে এখনও টাইপরাইটার চালায় বেলা অবধি। তাকে খাবারের জায়গা করে ডাকতে আসে ঠাকুর।

লীলা আশ-পাশেই থাকে হয়ত। হয়ত ছেলেটির সঙ্গে চোখো-চোখি হয় কিন্তু সে দৃষ্টিবিনিময় ভীরুতার গ্লানিতে কুৎসিৎ। তারা যেন দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে অপমান করে,—অপমান করে প্রেমের।

লীলার বয়স্ক কোন অভিভাবিকার কাছে কিছু শেখবার সুযোগ হয়নি। সে স্বাধীন সতেজ লতার মত বেড়ে উঠতে পারত। বাড়তে পারত বন্য কুরঙ্গীর মত। কিন্তু তা হ'ল না। দক্ষিণ সাগরের বাতাস শুধু নারিকেলপত্রপুঞ্জই দুলিয়ে দিয়ে গেল, আর কিছুকে দোলাতে পারলে না।

যে ছেলেটির নীল চোখের ওপর লম্বা পাতলা চুল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেও কোনমতে পারল না ভুলতে সে একজন মাইনে করা সামান্য টাইপিষ্ট পাত্র। বীরের মত সে আকাঙ্ক্ষা

করতে জানল না। লুব্ধ দৃষ্টিতে চাইল শুধু চোরের মত, নিজের অক্ষমতার অযোগ্যতার উপলব্ধি থেকে!

ছেলে যেখানে মাইনে করা সামান্য টাইপিষ্ট মাত্র, আর মেয়ে পঙ্গু দেবতার সেবিকা, সেখানে কি এমন কাহিনী হতে পারে, যা মেটাবে নগর-ক্লান্ত মনের তৃষা! প্রেমের এ নির্জীব কাহিনী শুনে কি লাভ?

একদিনও যদি মেয়েটি আসত ছাদে উঠে, দাঁড়াত এসে রাত্রির কালো আকাশের তলায়, আর হঠাৎ ধূলি-ধূমাচ্ছন্ন আকাশে আবিষ্কার করত চাঁদকে—বিদ্রোহী যে চাঁদ পৃথিবী থেকে গেছে সরে, সমস্ত স্বপ্ন আর সমস্ত রহস্য নিয়ে—যে চাঁদ সরে গেছে কিন্তু ছাড়েনি এখনও সঙ্গ, এখনও যে পৃথিবীকে ডাকে, ইঙ্গিত করে ভুলে যাওয়া কোন রক্তের রহস্যের!

একদিনও যদি ছেলেটি আসত নগর-প্রাকার থেকে বেরিয়ে, হাওয়ায় শুনত সাগরের আহ্বান—যে সাগর এখনও চাঁদকে ভোলেনি।

কিন্তু মেয়েটি পঙ্গু এক দেবতার কাছে নিয়েছে দীক্ষা। সে শাড়ী পরবার নতুন কায়দা দুরস্ত করে। ব্লাউজের কাট-ছাঁট নিয়ে করে আলোচনা। নতুন ফ্যাসানের কানের দুলের স্বপ্ন দেখে।

সুবোধবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার আজকাল ভাব।

"চোকো গলা আমার ভাই পছন্দ হয় না।"

"সেদিন বীণা এসেছিল ভাই—ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। কি সাজই সেজেছিল যদি দেখতিস্। আজকাল আবার কেউ জর্জ্জেটের শাড়ী পরে নাকি?"

"অণু আজকাল নাকি গান শিখেছে ভাই?"

"আহা কি গানই গায়। অণুর মার আবার তাই নিয়ে কি দেমাক। —অণুর নতুন গান শোনোান বুঝি। অণু তোর সেই নতুন গানটা গা'ত মা। নতুন গান ত কত। যত সেই সব পচা পচা গান, চড়াতে গেলে গলায় যেন কাঁচ কাটছে মনে হয়।"

"মিলিদি কিন্তু খুব ভালো গায় ভাই!"

"বাঃ মিলিদি বলে কিরকম শিখেছে। মিলিদির পিয়ানো শুনেছিস্?"

"না, শুনিনি ত। মিলিদির পিয়ানো এসেছে!"

"অনেকদিন ত এসেছে। বাবার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর খুব ভাব কিনা। আমাদের সব্বাইকে সেদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন। মিলিদি পিয়ানো শোনালে। ওদের মোটরে বেড়িয়েও এলাম!"

"ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে নাকি?"

"কে জানে ভাই!"

"তোর সঙ্গে এত ভাব, তুই জানিস্ না!"

"না ভাই, আমি কোথাও যাই-টাই না। মিলিদি কত বলে

তাই যেতে পারি না। আর কি করতেই বা যাব—যত সব আদেখলো গল্প শুনতে! বিয়ে যেন আর কারুর হয় না, হবে না, তবু যদি রাজা-উজিরের ঘরে বিয়ে হ'ত। মাষ্টারী ক'রে ত খায়। আজ এখন উঠি ভাই। তোর ও তুল তুটো এখনো পরে আছিস্? কি বিশ্রী দেখায়!"

"এইবার বদলাব ভাই!"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথা হয়,—"তোদের বাড়ীর ও ছেলেটি কে ভাই! ওই-যে বাইরের ঘরে দেখলাম আসবার সময়!"

"ও—ও বাবার কেরাণী, টাইপ করে।"

লীলা আজকাল সে কথা জানে—তাদের বাইরের ঘরে থাকে তাদের কেরাণী। মাত্র ত্রিশ টাকা হয়ত সে মাইনে পায়। নতুন ফ্যাসানের স্বপ্নের ফাঁকে হয়ত তাকে কখন কখন দেখা যায়। একটু দেখলে ক্ষতি নেই। তাতে বোধ হয় মান যায় না। তু-একটা কথাও কওয়া যেতে পারে মাঝে মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে, অথচ একটু আড়ষ্ট ভাবে।

"বইটা বদলে এনেছ লাইব্রেরী থেকে?"

"না, আজ আনব! এর মধ্যে ওটা পড়া হয়ে গেল!"

"বা, পড়া হবে না, আজ তিন দিন হ'ল এনেছ না।"

তারপর আর কি? তারপর আর কিছু বলা যায় না।

বলতে গেলে বাইরের এ খোলস অস্বীকার করে আনতে হয় গভীর হৃদয়-উৎসর ভাষা। এই নিরাপদ নির্জীবতার খোলসই তার চেয়ে ভাল। আর লীলা জানেও না যে খোলসের অন্তরালে আছে কিনা কোন জীবন।

এবার সে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে। অনিল সে দিকে চেয়ে থাকে একটু ব্যথিত ভাবে। আর হুটো কথা কইতে পেলে সে হয়ত খুসী হ'ত। এ আলাপকে আর একটু দীর্ঘ করতে সে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? না, কিছুর জন্যে নয়। সেও জানে সে সামান্য কেরাণী, মাত্র ত্রিশ টাকা তার মাইনে। সে সাগরের ডাক শোনে নি, তার মনে আছে শুধু চোরের মত একটু লজ্জাকর দুর্ব্বল লোভ। অক্ষমের একটু বাহাদুরীর বাসনা।

এই আলাপ, এই একটুখানি সঙ্গলাভ,—এ একটা বাহাদুরীর ব্যাপার। নির্লজ্জভাবে বন্ধুদের কাছে গল্প করবার মত বাহাদুরীর ব্যাপার! মাইনে কম হ'লে কি হয়! সে নেহাৎ মন্দ নেই। বন্ধুরা তাকে ঈর্ষ্যা করতে পারে। করেও বোধ হয়। তাই হলেই হ'ল। তার জন্যে হয়ত সত্য একটু ফাঁপিয়ে তোলা যেতে পারে। একটুখানি কল্পনা করলেই বা দোষ কি? বিপিনবাবুর কানে ত আর যাচ্ছে না।

না, অনিল সাবধান, সে নিজের অবস্থা বোঝে, জানে কোথায় তার স্থান। তবু একটু বাহাদুরী করলে বোধ হয় ক্ষতি নেই।

কিন্তু তাও যেন মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়। চাকরী সে খোয়াতে রাজী নয়। আজকাল যা বাজার।

লীলা একদিন হয়ত এসে বলে,—"আমায় একজিবিশনে নিয়ে যাবে আজকে? মানপোতার মাঠে নাকি খুব ভালো মেলা বসেছে!"

অনিল নিজের সৌভাগ্যে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কালই সে যে সবিস্তারে একজিবিশনে যাবার গল্প করেছে বন্ধুদের কাছে। মিথ্যা গল্প তাহলে সে করেনি।

বলে,—"আজকেই?"

"কেন, আজ তোমার কিছু কাজ আছে?"

"না কাজ আর কি।"

"আচ্ছা তাহলে আমি বাবাকে বলে রাখছি।"

মেলায় অবশ্য যাওয়া হয় না, বাবাকে জিজ্ঞাসাও সে করে নি। অমনি তার ভালো লাগছে না। মেলা ত আছেই। আরেকদিন গেলেই হবে। হয়ত বাবাই তাকে নিয়ে যাবেন।

শেষ পর্য্যন্ত মনে হয় এই বুঝি ভালো। কোথায় কিছু গোলমাল হবার ভয় নেই। সম্ভাবনা নেই কোন অশান্তির কোন বিশৃঙ্খলার। মন্থর হোক, মসৃণ ভাবে জীবন বইছে নির্দ্দিষ্ট খাতে। সীমা কোথাও সে লঙ্ঘন করে না। সীমা

লঙ্ঘনের অনেক বিপদ, অনেক দুঃখ, অনেক গ্লানি। এই তার চেয়ে ভালো।

অনিল বাইরের ঘরে টাইপ করে, চিঠি ড্রাফ্‌ট করে ব্যবসার, কখন কখন লাইব্রেরী থেকে বই বদলে আনে। ছোট-খাট ফায়-ফরমাজ খাটে একটু।

লীলা নতুন ধরণের ব্লাউজের ফ্যাসান শেখে। বিপিনবাবু তার জন্যে নতুন এক মাষ্টার রাখছেন। সে গানও শিখবে এবার।

হরেকৃষ্ণর দোকানে সাড়া পড়ে গেছে। চারদিন ধরে বিশ্বনাথকে আর দেখা যাচ্ছে না সেখানে।

এমন আশ্চর্য্য ঘটনা বিশ্বাস করাই শক্ত। বিশ্বনাথকে সকালে হরেকৃষ্ণর দোকানে না দেখতে পেলে বুঝি আকাশের দিকেও একবার চেয়ে দেখতে হয়। সন্দেহ হয় সব কিছু নিয়মমত আর ঘটছে না।

কিন্তু সব কিছু নিয়মমত ঘটছে শুধু বিশ্বনাথ আর দোকানে আসে না। দু'বছরের ভেতর অসুখ বলেও যে কোন দিন দোকানে আসতে কামাই করে নি তার হঠাৎ হ'ল কি?

"তার বাসায় খোঁজ করেছ? অসুখ বিসুক করেছে হয়ত।"

"না হে না, অসুখ করে নি। বাসায় তার তালা দেওয়া।"

"বাসায় তালা দেওয়া! গেছলে বুঝি ওদিকে?"

নারায়ণ স্বীকার করে সে গেছল। এখন আর স্বীকার করতে বুঝি দোষ নেই। সে শুধু ওদিকে যায় নি, বিশ্বনাথের কাছেই গেছল। বিশ্বনাথের কাছে মাঝে মাঝে সে গেছে

অনেকবার। আর তা যদি বল, তাহলে হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানের অনেকেই গেছে।

কথায় কথায় অনেক কিছু আজ প্রকাশ হয়। হয়ত ইচ্ছে করেই সবাই প্রকাশ করে। অকৃতজ্ঞ হাজার হলেও তারা নয়। বিশ্বনাথকে অন্য সময়ে অবজ্ঞা করা যেতে পারে। লোকটা কেমন যেন হাবা-গোবা। কেমন যেন চাষাড়ে তার চাল চলন। তার সঙ্গে লোক-লৌকিকতা করবার কথা মনে না থাকাই সম্ভব! হয়ত সবাই তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে ঠাট্টা-বিদ্রূপও বাদ যায় নি। কিন্তু তাহলেও লোকটা ভাল। মনটা বড় সাদা। এ কথা আজ স্বীকার করলে ক্ষতি কি?

বিপিন সবার আগে স্বীকার করে,—"যাই বল আমার ভাই মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বিশুদাকে ওই বেঞ্চির কোণে না দেখতে পেলে যেন আড্ডাই জমে না।"

"অত ভাবনা কেন হে! কোথায় গেছে হয়ত ক'দিন, আবার আসবে'খন।"

না, এও মিথ্যে আশা। বিশ্বনাথ আর বোধ হয় আসবে না। তারা শুধু তালা বন্ধ দেখেই ফিরে আসে নি। এবার জানা যায় দু' একজন খোঁজও করেছে। তালাটা বিশ্বনাথের নয়, বাড়িওয়ালার। বিশ্বনাথ একেবারে ভাড়াটাড়া চুকিয়ে দিয়ে—চলে গেছে। আসবার সম্ভাবনা আর তার নেই।

বিশ্বনাথ সম্বন্ধে এত আগ্রহ এতজনের ছিল আগে কে জানত? বিপিন বলে,—"কি আশ্চর্য্য ভাই! একবার জানিয়েও গেল না। এতদিনের আলাপ পরিচয়। একবার জানাতে কি দোষ হয়েছিল?"

এর পর আর একটু স্বীকার করতেও পারা যায়। বিপিন আবার বলে,—"আবার কি মুস্কিল দেখ। ক'টা টাকা আমার কাছে পেত! এখন কেমন করে আমি শোধ দিই বলত! টাকাটাও যাবার আগে চেয়ে গেল না! আশ্চর্য্য লোক!"

আশ্চর্য্য লোকই বটে। বিপিনই শুধু একা নয় আরও অনেকেই তার মত মুস্কিলে পড়েছে। লোকটা ঋণ শোধেরও সুযোগ না দিয়ে এমন হট্ করে চলে যাবে তা কে জানত!

হ্যাঁ তারা সময়ে অসময়ে দু' দশ টাকা বিশ্বনাথের কাছে নিয়েছে এ কথা আজ গোপন করে লাভ কি? সে টাকা তাদের শোধ দেবারও ইচ্ছে ছিল। তবে বিশ্বনাথ কখনো সে টাকা চায় নি। তারাও দেব-দেব করে আর দিয়ে উঠতে পারে নি।

বিপিন আবার বলে,—"মনটা যাই বল ভাই দরাজ ছিল বিশুদার। কোনদিন 'না' বলতে দেখিনি। চাকরী যাবার পর সেবার ছেলেটার অসুখ নিয়ে কি বিপদেই পড়েছিলুম। বিশুদা না থাকলে ছেলেটাকে কি বাঁচাতে পারতুম!"

বিপিনের কথা অনেকেই সমর্থন করে। বিশ্বনাথের কাছে

হাত পেতে কেউ নিরাশ হয় নি সত্যি। শুধু তাই নয় বিশ্বনাথ নিজে থেকেও অনেকের অনেক কিছু করেছে।

সেই অম্বিকার ব্যাপারটা আর কে ভুলেছে? অম্বিকা অবশ্য সে কথা স্বীকার করে নি। আজকাল সে এ পাড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বনাথও জাঁক করে সে কথা কাউকে বলে বেড়ায় নি। তবু কি কারুর বুঝতে বাকী ছিল।

সবাই এ খবর জানে না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে— "কি হয়েছিল কি ?"

"হবে আবার কি ? চুরী করেছিল। নন্দ মুদীর মনোহারী দোকানে কাজ করত আর লুকিয়ে খেলত জুয়া। টাকার খাঁকতি ত হবেই। তলে-তলে তাই মালপত্র কিছু লোপাট করে দিয়েছিল। কিন্তু নন্দর ভাইপো গোবিন্দকে ত আর ফাঁকি দেবার উপায় নেই। একদিন ঠিক ধরে ফেল্লে, মাল মেলাতে গিয়ে।"

"তারপর ?"

তারপর অম্বিকা রাত্রে চা খেতে এসে মন-মরা হয়ে বসে থাকে !

"কি হল অম্বিকা !"

অম্বিকা বলে—"দেখোত ভাই অন্যায়। মনোহারী দোকানের অমন লাখো জিনিষ, সাত জনে সাত দিকে বিক্রী করছে। তার

ভেতর কোন জিনিষটা কোন দিক দিয়ে হারাল বলে দোষ হ'ল কিনা আমার! আমি এ কাজ ছেড়ে দেব—ঝকমারীর কাজ!"

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা বলে মনে হ'ল না। অম্বিকা ছাড়তে চাইলেও গোবিন্দ ছাড়তে চায় না। অম্বিকা যদি ক'দিনের মধ্যে সব হিসেব না ঠিক করে দেয়, সে একেবারে জেলে দেবে বলে শাসিয়েছে।

অম্বিকা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বসে থাকে দোকানে। বলে—"তু'বছর ভাই দেশে যেতে পারিনি! ভেবেছিলাম কিছু টাকা-কড়ি একেবারে জমিয়ে যাব। ক'দিন ধরে মনটা বড় টানছে। এখন যদি এই সব হ্যাঙ্গাম হুজ্জুৎ হয় তাহলে আর ভাই কবে দেশে যেতে পাব কে জানে! ফন্দি-টন্দি করে যদি জেলেই দিয়ে দেয়!"

অম্বিকা তারপর কেঁদেই ফেল্লে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে দেশে অম্বিকা তার ছেলেমানুষ বৌ আর একটি মেয়ে ফেলে এসেছে একথা সবাই জানত। রোজগার না করে দেশে মুখ দেখাবে না, এই নাকি ছিল তার পণ। কে জানে হয়ত সেই জন্যেই সে তাড়াতাড়ি পয়সা উপায়ের এত ফিকির খুঁজেছে।

সবাই জিজ্ঞাসা করেছিল—"কি ব্যাপারটা হয়েছে বল দেখি খুলে।"

অম্বিকা বলেছিল—"কি জানি ভাই কার একজনের নামে দোকান থেকে ধারে জিনিষ গেছে অনেক, অথচ এ পর্য্যন্ত তার দাম মেলেনি। লোকটার নামও অদ্ভুত। তেমন নামের কেউ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সহরে।"

"তাতে তোমার দোষ হ'ল কি করে? নাম আর ধারের হিসেব ত লেখে সরকার! আর দোকানে বিক্রী ত তুমি একলা কর না! আসবার সময়ও হাতে করে কিছু নিয়ে এস না!"

অম্বিকা বল্লে—"সেই কথাই ত ভাই আমিও বলছি! কিন্তু সরকার মশাই বলেন যে আমিই নাকি সে নাম তাঁকে লিখতে বলেছিলুম, আর জিনিষ-পত্র যা গেছে আমার লেখানোতেই গেছে। এখন গোবিন্দ বলছে এ সব জিনিষের দাম না ধরে দিলে গোলমাল করবে। আমি কোথা থেকে দাম দিই বল ত!"

অম্বিকা তারপর অনেকক্ষণ ধরে চোখ মুছেছিল। বলেছিল আর একবার—"দু'বছর ভাই দেশে যাই নি। যদি জেলই হয়ে যায়..."

কেউ আর কিছু কথা বলেনি। বলবারই বা ছিল কি? অম্বিকের ওপর মায়াও হয়েছে সকলের কিন্তু কাজটা সে যে খুব গর্হিত করেছে এ আর কে না বুঝেছিল। কিন্তু অম্বিক যখন

চায়ের দোকান থেকে উঠে গেল তখন বিশ্বনাথ গেল তার সঙ্গে।

তারপর আর কি? শোনা গেল অম্বিকের গোলমাল সব চুকে গেছে। সে দেশে যাচ্ছে। তার নাকি কোন দোষ নেই। বিশ্বনাথই নাকি মাল-পত্র কিছু ধার নিয়েছিল। দাম দেবার কথা এতদিন মনে ছিল না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বিশু-দা, তুমি আবার মনোহারী দোকানে সওদা কর নাকি!"

বিশ্বনাথ মুখ কাঁচু-মাচু করে বল্লে,—"বড় ভুল হয়ে গেছে ভাই। দামটা দিতে মনে ছিল না। অম্বিকার মিছি-মিছি খানিকটা শাস্তি হ'ল।"

জিজ্ঞেস করলাম—"নামটা আলাদা হ'ল কেন?"

বিশ্বনাথ আম্‌তা-আম্‌তা করে যেন চোরের মত বল্লে—"কি জানি ভাই, বুড়ো সরকার কানে একটু খাটো। কি শুনতে কি শুনেছে!"

বিশ্বনাথ সম্বন্ধে আজ আরো অনেক গল্পই চলে। বিশ্বনাথকে তারা অবজ্ঞা করেছে সত্য। লোকটার ভেতর কি যেন ছিল যাতে বাইরে থেকে তার ওপর শ্রদ্ধা আসে না। কিন্তু ভেতরে লোকটার পদার্থ ছিল এ কথা সবাই আজ স্বীকার করে।

নারায়ণ বলে,—"আচ্ছা বিশু-দা এমন হট্ করে গেলই বা কেন বল দেখি? সত্যি! খবরের কাগজের জন্যে কি মুখনাড়াটাই দিয়েছি। এখন দুঃখ হচ্ছে।"

তারপর একটু হেসে বলে,—"মামলার খবর, মামলার খবর করত! মামলার খবর যখন বেরুল তখনই কিনা বিশু-দা উধাও!"

কে একজন বলে,—"পড় ত হে মামলার খবরটা! কি মামলার জন্যে লোকটা এমন ক্ষেপত দেখি!"

নারায়ণ তাচ্ছিল্যভরে বলে,—"হ্যাঁ ওই মামলার খবর আবার পড়বে! বিশু-দার মাথায় ছিল ছিট্ তা বুঝতে পার নি। নইলে কোন মুল্লুকের কোন ছেঁড়া মামলা, তার জন্যে ওর মাথা-ব্যথা কেন হবে!"

"তবু মামলাটা কিসের শুনি!"

"পশ্চিমের কোন এক ব্যাঙ্কের কেশিয়ারের নামে মামলা। জুচ্চুরি করে টাকা সরিয়ে এতদিন ফেরারী ছিল এইবার বুঝি ধরা পড়েছে।"

বিপিন চমকে উঠে ভ্রূ কুঁচকে বলে,—"তাইত! ব্যাপারটা কিরকম যেন···"

নারায়ণ তার কথার মাঝখানেই হেসে ওঠে,—"না হে না, তা নয়। ধরা পড়েছে আজ পাঁচদিন সেই পশ্চিমের এক

সহরে। বিশু-দা তখন এখানে বসে। আমিই শোনালাম খবর! তুমি যেমন পাগল!"

বিপিন তবু বলে,—"এতক্ষণ ত কাগজটা খোলাই হয় নি। দাওনা দেখি একটু।"

"নাও, দেখ! তোমার আর তর সয় না।"

বিপিন কাগজটা খুলে পড়তে আরম্ভ করে তারপর হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলে,—"ভারী গোলমেলে ব্যাপার কিন্তু ভাই। কেশিয়ার ত ধরা পড়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। যে লোকটার সঙ্গে সট্ করে কাজ হাসিল করেছিল সে লোকটা কিন্তু এখনও ফেরার। কেশিয়ার তার নাম-ধাম পরিচয় সব দিয়েছে, দেখ না!"

"দেখি" বলে, এবার নারায়ণ ছোঁ মেরেই কাগজটা নেয় কেড়ে। তার পড়া শেষ হতে না হতে আরো দশটা হাত কাগজের দিকে এগোয়।

বিশ্বনাথের সেই ছেঁড়া মামলার খবর আজ সবার কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

পড়া হলে সবাই একটু যেন বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে। না, এ কখনো সম্ভব নয়। এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। পৃথিবীটা তাহলে বড় জটিল হয়ে পড়ে। মোটা মোটা মার্কা দিয়ে সব কিছু সোজা-সুজি ভাগ করা চলে না বিশ্বনাথকে

তারা ভাল করেই জানে, সঙ্কুচিত ভাবে থাকত বসে ওই বেঞ্চিটির একধারে, হাত পাতলে যার কাছে কেউ কখন নিরাশ হয়নি। সবার অবজ্ঞা সে সহ্য করেছে নীরবে। জাল করে যে ব্যাঙ্কের টাকা মারতে পারে তাকে ত দেখলেই তারা চিনতে পারত। সে কখন অমন হতে পারে না, তাহলে আর ভালো-মন্দের তফাৎ রইল কোথায়?

মানপোতার মাঠে খুব বড় মেলা বসেছে। রাতারাতি কে যেন বসিয়েছে কাপড়ের ছোটখাট সহর। তাঁবু আর দরমার ঘর সারা মাঠ জুড়ে। চারিধারে টিনের দেয়াল।

রাত্রে বাদামতলার মোড় থেকে পর্য্যন্ত সেখানকার আলো দেখা যায়, শোনা যায় বাজ্‌না। সে বাজ্‌না আর রঙীন সে আলো সমস্ত সহরতলিকে প্রলুব্ধ করে।

ইটকাঠের সহরে থেকে মানুষ কি হাঁফিয়ে ওঠে কোনদিন? হয়ত ওঠে। তারপর হাঁফ ছাড়তে যায় কোথায়? বাইরে আর কোথাও নয় যায় কাপড়ের সহরে। সেখানেও টিনের প্রাকার দরমার ঘর। সেখানেও চারিদিক ঘেরা। ঘেরা না থাকলে কি চলে!

মেলা বুঝি মস্ত বড় একটা নাম নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। খুব সভ্য খুব ভব্য এক নাম। কিন্তু তারপর সে নাম গেছে মুছে। ধীরে ধীরে তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে।

মেয়েরা এখনও মেলায় যাবার জন্যে বায়না ধরে। কিন্তু পুরুষেরা আর নিয়ে যেতে চায় না।

“মেলা ত একদিন দেখা হয়েছে! রোজ রোজ আবার যাওয়া কিসের? নতুন কিছু ত আর নেই।”

নতুন কিছু হয়ত নেই কিন্তু মেয়েদের রাত বারোটা পর্য্যন্ত খাবার ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে হয়। পুরুষেরা আজ-কাল সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারে না।

কেমন করে ফিরবে! ইটকাঠের সহর থেকে, হাঁফ ছাড়বার জন্যে তারা যে গেছে বাইরে। সেখানে কাপড়ের তাঁবু, টিনের দেয়াল-ঘেরা মাঠে সেখানে রঙীন আলো!

কয়লার ডিপোর দুলাল ছেঁড়া গায়ের কাপড়টা ভাল করে জড়িয়ে, একা রাস্তায় এসে নামে। শীতটা এবার কিছুতেই যেন যাচ্ছে না। আর বেশী রাতে মাঠের মাঝে ঠাণ্ডাটা যেন আরো সাঙ্ঘাতিক মনে হয়। গায়ের কাপড় ফুঁড়ে যেন হিম হাওয়া পাঁজরার ভেতর গিয়ে ঢোকে। তবু দুলাল সুবিধে থাকলে আরও খানিকক্ষণ থাকত। এখনও নেহাৎ অনিচ্ছাতে সে বেরিয়ে এসেছে, নেহাৎ মেলার গেট বন্ধ হয়ে গেছে বলে। শেষ দু'দান তার ত কপাল ফিরেই গেছ্‌ল। আর একটু সময় পেলে মূল না হোক আজকের হারের টাকাটা সে তুলে আনতে পারত। কিন্তু ঠিক তার হাত যখন খুলেছে সেই সময়েই কি

বারোটা বাজতে হয়! বিশেষ করে আজকের দিনে! এমনিই তার ভাগ্য! আর বাজলোই বা বারোটা, আর কি দু'এক দান খেলতে দিতে নেই? এ সবই জুয়াচুরী,—ফাঁকি দেবার ফিকির ছাড়া কি?

দুলাল সব বোঝে, মনে মনে সে আগেও ঠিক করেছে আর সে আসবে না। যা গেছে তা যাক্। নতুন করে লোকসান আর করা কেন? কিন্তু তার পরদিন সন্ধ্যায় আবার মন খুঁত খুঁত করেছে; মনে হয়েছে আর কিছু না, শুধু লোকসানের টাকাটা তুলে নিয়েই সে ফিরে আসবে। কে বলতে পারে আজ হঠাৎ তার কপাল খুলে যেতে পারে কিনা? তার সামনেই ত শিবু কাল উপরো-উপরি তিনটে দান মেরে দিলে। দুলাল ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

বৌ হেঁকে জিজ্ঞাসা করেছে,—"কিগো আজকেও রাত বারোটা করবে নাকি? আমি পারবো না বলছি তাহলে জেগে থাকতে!"

দুলাল একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছে—"না, না, আজ এখুনি ফিরব। কাল একটু হয়ে গিয়েছিল বলে কি রোজ হবে নাকি!"

কিন্তু রোজই তাই হচ্ছে। বৌ রাগারাগী করে, বলে, "আজ আর দরজা খোলা পাচ্ছ না মনে থাকে যেন। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সারা রাত আমি জাগতে পারব না!"

দুলাল কোন কথা না বলে বেরিয়ে পড়ে। কথা বলার মুখ আর তার নেই। তারপর রাতে এসে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সে দরজায় ধাক্কা দেয়। বৌ-এর এত রাত পর্য্যন্ত শীতের ভেতরে জেগে থাকার কি যে কষ্ট তা সে জানে। সারাদিন সত্যি বেচারীর একটু নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ থাকে না। কোলে পিঠে কাঁকালে তিন তিনটি ছেলে মেয়ে। সাহায্য করবার একটা লোক অভাবে একাই তাকে সব দিক সামলাতে হয়। বৌ অবশ্য সে জন্যে কোনদিন মুখ ভার করে নি। কাঁদুনী গাওয়া তার স্বভাব নয়। কিন্তু তা বলে, সেই খাটুনীর ওপর অর্দ্ধেক রাত ভয়ে ভয়ে একলা জেগে থাকার কষ্ট সত্যি তাকে দেওয়া যায় না। দুলালের নিজের ওপর ঘৃণা হয়। কি করছে সে! এমন ত সে ছিল না। এখনও যে সে এমন হতে চায় না। কিন্তু তবু কি যেন আকর্ষণ তাকে অসহায় ভাবে টেনে নিয়ে যায় প্রতিদিন। কিছুতেই সে নিজকে ধরে রাখতে পারে না। শুধু পয়সার লোভে এ নয় সে জানে। এ যেন তার ভেতরকার অজানা, উচ্ছৃঙ্খল একটা আলাদা প্রবৃত্তি—সর্ব্বনাশেই যার আনন্দ।

দরজা ধাক্কা দিয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। খানিক পরেই খিল খোলার শব্দ পাওয়া যায়। বৌ জেগেই ছিল তাহলে! দুলালের মনে হয় একদিন বুঝি সত্যি না জেগে

থাকলে ভালো হ'ত। তবু যেন তার অপরাধ তাতে একটু হাল্‌কা হ'ত। বৌ-এর মুখের দিকে না চেয়ে চোরের মত ছুলাল গিয়ে ঢোকে নিজের ঘরে। বৌ দরজা বন্ধ করে আসার পরই ঘর থেকে একটু গলা চড়িয়ে বলে, "আজ আর খাব না কিছু।" বৌকে একটুখানি কষ্ট থেকে অন্ততঃ সে বাঁচাবে। এটুকু প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা কিন্তু সফল হয় না। বৌ সেকথা কানেই তোলে না।

খাবার-দাবার সাজিয়ে বৌ ভারী গলায় ডাকে,—"নাও উঠে এস।"

ছুলাল একটুখানি কি ভাবে, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে আসনে গিয়ে বসে।

এমনি চলে আসছে ক'দিন। কিন্তু আজ ছুলালের ভয় করে। শুধু বৌ-এর সামনে যেতেই তার ভয় করে এমন নয়, সংসারের কাছেই মুখ দেখাতে তার ভয়।

কেন কি তার হয়েছে? না বেশী কিছু নয়। ডিপোয় আর কয়লা নেই। ওয়াগন খালাসের জন্যে যে টাকা অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাতেও আজকে সে হাত দিয়েছে। মানপোতার মাঠ থেকে সে টাকা আর উঠে আসবে না। কাল আর ওয়াগন খালাস হবে না, ডিপো থেকে খদ্দের ফিরে যাবে।

কিন্তু এই জন্যেই মানুষের কাছে মুখ সে দেখাবে না কেন? ব্যবসার এমন দুর্দ্দিন ত আসেই। লোকে আবার সামলেও ওঠে।

কিন্তু দুলালের সে ভরসাও যে নেই। আর সামলে সে যে উঠতে পারবে না। যেখানে যা ধার করবার সে করেছে। আর কোথায়ও টাকা সে পাবে না। বৌ-এর গায়ে একরত্তি সোনা পর্য্যন্ত নেই যে বাঁধা দেবে। এবার সে ডুবেছে সত্যিই।

কাল সকালে তার ছেলেমেয়েরা জেগে উঠবে। তাদের ছোটখাট বায়না, ছোটখাট আবদার কালও হয়ত সে মেটাতে পারবে। কিন্তু তারপর? তারপর কোথাও কোন কূল নেই। তার ব্যবসা গেছে। কোথাও কোন সাহায্য আর তার মিলবে না। পাওনাদারেরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে। ফাঁকি দিয়ে, স্তোক দিয়ে কতদিন আর সে চালাতে পারে!

অথচ কিছুদিন আগেও সে ত ভালই ছিল। দুঃখ তার ত তেমন কিছু ছিল না। দেশে জ্ঞাতি-শত্রুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে হায়রান হয়ে সব বেচে কিনে সে এসে ব্যবসা সুরু করেছিল। সে ব্যবসা থেকে তার ত একরকম করে বেশ চলে যাচ্ছিল। সুখে দুঃখে ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছিল। সুখে দুঃখে তাদের সংসার চলছিল। এর বেশী আর কি সে চাইতে

পারে! ছাপোষা গৃহস্থ। দুলাল তার বেশী কিছু নয়। তার বেশী কিছু হবার তার ক্ষমতা নেই, আশাও নেই—এইত মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল দুলাল যেন এমনি জীবনের জন্যেই তৈরী; এর বাইরে সে যেতে পারে না। কিন্তু তবু সে এ জীবনে সন্তুষ্ট রইলো না! কে জানত সাধারণ, চিরন্তন মাটির ঢেলা সে নয়, সেও কয়লা? তার ভেতরও আছে আত্মঘাতী আগুনের শিখা ঘুমিয়ে! সবারই ভেতর অমনি আগুন থাকে ঘুমিয়ে! মাটির ঢেলা হয়ত কোথাও সত্যি নেই, সবই কয়লা। ছদ্মবেশী কয়লা।

অন্ততঃ দুলালের এই সাধারণত্বের আড়ালে এমনি শিখা যে ঘুমিয়ে ছিল এটা ঠিক। সে শিখা অবশ্য আত্মঘাতী। মানপোতার রঙীন আলোর সঙ্কেতে বেরিয়ে এসে সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করেছে, সর্ব্বনাশেই তার আনন্দ।

কিন্তু এ শিখা আত্মঘাতী হয়েই বা দেখা দেয় কেন? কেন হাঁফ ছাড়তে সহরতলির মানুষকে যেতে হয় শেষ পর্য্যন্ত কাপড়ের আর টিনের দেওয়ালের সহরে?

দুলাল নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে চলে। আজ আর তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। কি হবে বাড়িতে ফিরে? বৌ-এর মুখের পানে আর সে তাকাবে কেমন করে! কাল কেমন করে লোকের কাছে মুখ দেবাবে? ক'টা টাকা

এখনও আছে। কিন্তু এ ক'টা টাকা আর ক'দিন ? তার পর ত অন্ধকার ! বৌ ত কিছুই জানে না। স্বামীর ওপর নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটবে। ছেলেমেয়েরা বাপের প্রতি সরল নির্ভরতায় বায়না করবে। আর নীরবে সব জেনে-শুনে দুলালকে ভান করতে হবে নিশ্চিন্ততার।

তার চেয়ে একদম বাড়ি না ফিরলে হয় না ? দুলালের মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। কিছু বিচার করবার তার ক্ষমতা নেই। শুধু এই আগুনের জ্বালা থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। উত্তেজিত অবস্থায় তার মনে হয় মুক্তি পাওয়া খুব সহজ। তার এ ছেঁড়া গা'র কাপড়টা কোথাও ঝুলিয়েই সে মুক্তি পেতে পারে। তারপর যা হবার হয় হোক। তাকে ত আর দেখতে হবে না ! তা ছাড়া তার জীবনের আর মূল্য কি ! অসহায় ছেলে-মেয়ে-বৌকে সে পথে ভাসিয়েছে তার ত এমনি পরিণাম হওয়াই উচিত।

দুলাল কেউ কোথাও আছে কিনা ভালো করে এবার চেয়ে দেখে। সে মুক্তিই নেবে !

আশ্চর্য্য ! কি বা হয়েছে এমন দুলালের ! কিছুই বিশেষ হয়নি। সামান্য ক'টা টাকা সে উড়িয়েছে, হয়ত তার ছেলে-মেয়েরা ক'দিন বাদে খেতে পাবে না, কোথাও ধার পাবার আর তার উপায় নেই। এই জন্যেই এত ? কিন্তু দুলাল ত জানে না

বন্ধুর গলায় ছুরি দিয়েও মানুষ বাঁচবার জন্য আইনের ফাঁকির সাহায্য নেয়। হাজার হাজার অসহায় লোকের সর্ব্বনাশ করে' নির্ব্বিকার ভাবে মানুষ ফুলের বাগান করে।

তুলাল রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভেতর নামে এবার। কলা-বাগানের এদিকটা এখনো ফাঁকা। দূরে অন্ধকার ঝাঁকড়া ক'টা গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বেশী দূর তার যাওয়া হয় না। অন্ধকারে একটা লোক তার এত কাছে ছিল কে জানত! এত রাত্রে এ পথে কেই বা ঘুরে বেড়াচ্ছে! তুলাল একটু অবাক হয়ে বলে,—"কে, শিবু নাকি?"

লোকটা মাটির ওপর দিয়ে যেন ক্লান্ত ভাবে পা টেনে টেনে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। তুলাল তাকে চেনে, একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলে,—'বিলাস বাবু!'

"হ্যাঁ। তুমি মেলা থেকে ফিরছ বুঝি?"

তুলাল লজ্জিত ভাবে সে কথা স্বীকার করে। বিলাস বাবু বলেন,—"বাড়ি যাচ্ছ ত? চল এক সঙ্গেই যাই। আমিও ওদিকে যাচ্ছি।"

তুলালকে ফিরতেই হয়। বিলাস বাবু সারা রাস্তা নীরবেই চলেন। কোন প্রশ্ন যে তিনি করেন না এতেই তুলাল অসীম স্বস্তি বোধ করে।

তারপর বাড়ির দরজায় সেই কুণ্ঠিত ভাবে আঘাত দেওয়া। আজও বৌ জেগে আছে। দরজা খুলে যেতে দেরী হয় না।

খানিক বাদে বৌ ভারী গলায় ডাকে,—"নাও খেতে এস।"

সহর-সীমান্তের মন্থর স্রোত আগেকার মতোই বয়। কোথাও কিছু বুঝি তফাৎ নেই। হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে পর্য্যন্ত নতুন কিছু শোনা যায় না। বিশ্বনাথের কথা এখন পুরোনো হয়ে এসেছে। অমল ডাক্তারের উন্নতি নিয়েও আর নতুন কিছু বলবার নেই! নতুন বুঝি একটু মানপোতার মেলা উঠে যাওয়ার গল্প। কিন্তু সেও ত কম দিন হল না। মেলা কেন উঠল কেউ ঠিক জানে না। ভেতর থেকে কেউ বুঝি চাপ দিয়েছিল। হয়ত অমল ডাক্তারই হবে।

মেলা উঠে যাওয়া ভাল কি মন্দ তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

"কি ক্ষতিটা হচ্ছিল বাপু! সন্ধ্যা বেলা তবু একটু যাবার জায়গা ছিল! একটু তবু ফুর্তি হত।"

"হ্যাঁ ফুর্তি ত কত! ঘরে আগুন দিয়ে যেমন বাজী পোড়ান। ও ফুর্তি করতে গিয়েই একটা লোক গলায় দড়ি দিলে শেষ পর্য্যন্ত!"

"কে গলায় দড়ি দিলে জান না? ওই ত কয়লার ডিপোর দুলাল! মানপোতার মাঠে সব খুইয়ে এসে রাত্তির বেলা কড়ি কাঠ থেকে ঝুলে পড়লো না! আহা ছেলে মেয়ে বৌ সব অঘোরে ঘুমোচ্ছে—কেউ জানতেও পারে নি।"

মানপোতার মেলায় সর্ব্বনাশ অনেকের হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তবু কি একটু মন খুঁত খুঁত করে না! সন্ধ্যাবেলা বাদামতলার মোড় থেকে দূরে রঙীন আলো দেখবার জন্যে মনটা উৎসুক হয় না একটু?

মাটির ঢেলা কোথাও নেই। সবই ছদ্মবেশী কয়লা। কম বেশী সকলেরই ভেতর আগুন আছে লুকিয়ে।

হরেকৃষ্ণর চায়ের দোকানে তাই মেলার কথাটা এখনও অনেকবার ওঠে। এইটেই বুঝি একটু নতুন।

আর কোন নতুন খবর তারা জানে না। সহরে আর নতুন কি হচ্ছে! কি-ই বা হবে! আজকের দিন অনেকটা গত কালেরই মত।

তার পরের দিনও হয়ত কোন তফাৎ দেখা যাবে না। মানুষ ইটকাঠের দেয়াল তুলে মাটি ভাগ করেছে। অনেক কষ্টে বেঁধেছে সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট পথ। তফাৎই বা হবে কেন? শুধু মাঝে মাঝে মানুষ হাঁফিয়ে উঠতে পারে। সেদিন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সর্ব্বনাশা শিখা। কিন্তু

তাতে সে নিজেই যাবে পুড়ে। আর কিছুই বদলাবে না।

না, হরেকৃষ্ণর দোকানে নতুন খবর কিছু পাওয়া যাবে না। সহরে কত লোক আসছে যাচ্ছে, তা নিয়েও আর খবর হয় না। তাছাড়া তারা শুক্‌নির নামও শোনে নি। একদিন শুকনো খোসা ওঠা মুখ নিয়ে একটি লোক শিবুর পানের দোকানে বিপিন-বাবুর বাড়ির পথ জানতে চেয়েছিল। সেই লোকটিকে হয়ত সহরে আর দেখা যায় না। তাতে কি আর আসে যায়! কেন সে এসেছিল কেনই বা সে গেল, তা নিয়েও গবেষণা করবার কিছু নেই।

বিপিনবাবু পর্য্যন্ত সে কথা নিয়ে মাথা ঘামান না। পুরোনো একটা খবরের কাগজ তাঁর সিন্দুকে এখনও তোলা আছে। সে খবরের কাগজের কথা এখন অনায়াসে নির্ভয়ে তিনি ভুলতে পারেন। বিলাসকে প্রথম কয়েক দিন দেখতে না পেয়ে তিনি অবশ্য একটু ভয় পেয়েছিলেন। দুর্ভাবনাও হয়েছিল। তার সঙ্গে তিনি বড় বেশী জড়িয়ে আছেন। এতদিন বাদে সে কি বেঁকে দাঁড়াতে পারে? কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়ে তার কি লাভ! সে নিজেও ত রেহাই পাবে না তাহলে। তবে নিজের অংশ নিয়ে সে এখন সরে দাঁড়াতে চাইতে পারে। সেই জন্যে একটু ভয় আছে বটে। বিলাসের বুদ্ধিতে বিশ্বাস করে বিপিনবাবু

ঠকেন নি। তাঁর টিনের চাল গিয়ে পাকা দোতালা ওঠবার পর বাইরে আর কিছু উন্নতি হয় নি বটে, কিন্তু ভেতরে তিনি শাঁসালো হয়ে উঠেছেন। নিজের ও মেয়েটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এই সম্পদের অংশ বিলাসকে দিতে তাঁর মন সরে না। বিলাসের ন্যায্য প্রাপ্য আছে বটে, কিন্তু কি হবে তার প্রাপ্য দিয়ে? তার কি দরকার? একবার তাকে ফাঁকি দেওয়া গেছে আর একবার দেওয়া যায় না? বিলাস এ পর্য্যন্ত কোন দিন অবশ্য কিছু নেয় নি। বিপিনবাবুর লোভ আর আশাও তাই বেড়ে গেছে।

কয়েকদিন তিনি একটু অস্বস্তিতে কাটিয়েছেন। বিলাসের এই অন্তর্দ্ধান হওয়ার ভেতর কিছু মতলব আছে নাকি! কিন্তু তারপর তিন নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন। কাউকে আর ভাগ দিতে হবে না ভেবে উল্লসিতও হয়েছেন। বিলাস আর একেবারে না ফিরতেও পারে। বিলাসকে তিনি একটু-আধটু চেনেন বই কি! সে সব পুরোনো কথা টেনে এনে লাভ নেই। পুরোনো একটি খবরের কাগজের পাতায় হয় ত তার সব রহস্য চাপা রইল। তবু দু'একটা কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

বহুকাল আগে প্রাচীন এক তীর্থক্ষেত্রের নোংরা এক ঘেঞ্জি সহরে একটি শুকনো চেহারার লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মস্ত বড় ডাক্তার নাকি সে, তার নামের পেছনে সাগর

পায়ের ছাপ। কিন্তু চেহারা দেখে চেনবার যো নেই; মুটে-মজুর বলে মনে হয়। লোকটা যে উন্মাদ তাও তিনি তখনই বুঝেছিলেন। আজগুবি তার সব স্বপ্ন, অদ্ভুত তার কথাবার্ত্তা। তখন থেকেই সে অসাধ্য সাধন করছে। শুধু তার পয়সার অভাব।

বিপিনবাবু তাকে বুঝি একটু হাতে রেখেছিলেন নিজের কোন উদ্দেশ্যের জন্যে। তারপর এক রাত্রে তার সাহায্যে সামান্য একটা কাজ উদ্ধার করেছিলেন। এমন আর কি অন্যায় কাজ? এ কাজে নামাবার জন্যে তাঁর সামান্য একটু বেগ অবশ্য পেতে হয়েছিল। আশা দিতে হয়েছিল একটু বেশী করে। কিন্তু তবু কাজটা সত্যি বিশেষ কিছু গর্হিত নয়।

বিশ্ব-কৃপণ সে বুড়োর টাকা জীবনে কেউ ভোগ করতে পায় নি। তার মৃত্যুর পর হয়ত পাঁচভূতে লুটে নিত। তার বদলে না হয় বিপিনবাবুই সেটা নিয়েছেন। তিনিও ত একজন আত্মীয়।

সে রাত্রের কথা এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে বইকি! সহরের সে প্রান্ত অত্যন্ত ঘেঞ্জি। অথর্ব্ব প্রাচীন বাড়িগুলো যেন পরস্পরের ওপর ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাগুলো সুড়ঙ্গের মত। সেই রাস্তার ধারের এক বাড়িতে গভীর রাত্রে একদিন তিনি ঢুকেছিলেন। ঢুকেছিলেন ডাক্তারের নাম করে। নইলে সেখানে বুঝি প্রবেশ করা যেত না। সেই

আগামী কাল

নির্জ্জন বাড়ির একটি অন্ধকার ঘরে অথর্ব্ব এক অশীতিপর বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শুয়ছে ; তবু সে কাউকে ডাকবে না। অনেক তার টাকা। সে টাকা সে কাউকে দিতে চায় না। গত আট বছর সে ওই নির্জ্জন বাড়িতে সে টাকা পাহারা দিচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছ থেকে সেই জন্যে সে পালিয়ে এসেছে, কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। বিপিনবাবু আগে অন্য রকম চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। শেষকালে ভাগ্য তাঁকে এই সুযোগ দিয়েছে। বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। এখনও কিন্তু সে খবর কেউ পায় নি।

নীচে বৃদ্ধা এক হিন্দুস্থানী দরজা খুলে দিয়েছিল। রাত্রে মনিবের কাউকে ঢুকতে দিতে মানা। কিন্তু ডাক্তারের নামে সে আপত্তি জানাতে সাহস পায় নি। ডাক্তারকে সে চেনেও। এ বাড়িতেও আগে দেখেছে। বিপিনবাবুর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ডাক্তারকে নিয়ে তিনি ভেতরে গেছলেন। তারপর আর তিনি বাধা পান নি। তখন বৃদ্ধের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। সকাল হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। কোথা থেকে আর কোন আত্মীয় বার হয়ে পড়বে কে জানে! ডাক্তারের পরিচর্য্যার আড়ালে তিনি তাই দ্রুত নিজের কাজ করে গেছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কল্পনানুযায়ীই সব কিছু ঘটেছিল ; শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া।

ছোট একটি মেয়ের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। গভীর রাতে কোথা থেকে সে উঠে এসেছিল কে জানে! এসে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিল সরল দুটি চোখ আনন্দে বিস্ফারিত করে,—"তোমরা বুঝি দাদুকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছ! আমাকেও নিয়ে যাবে?"

বিপিনবাবু হেসে কথা দিয়েছিলেন। কেন যে দিয়েছিলেন তা তিনি নিজেই জানেন না, হয়ত অমনি কিছুই না ভেবে খেলার ছলে।

কিন্তু সেকথা তিনি রেখেছেন।

* * *

তারপর বিপিনবাবু অবশ্য সঙ্গীকে ফাঁকি দিতে দ্বিধা করেন নি। দ্বিধা-সঙ্কোচ অনেক বিষয়েই তাঁর কম। কিন্তু কয়েক বছর বাদে বিলাস তাঁকে খুঁজে বার করেছিল। খুঁজে বার করার গরজও তার ছিল বটে। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর জানাজানি হতে আর কিছু বাকি ছিল না। কোথা থেকে বৃদ্ধের অনেক ওয়ারিশ বেরিয়ে পড়েছিল। খোঁজ পড়েছিল তার নাতনীর, তার সঙ্গে বিপিনবাবু ও সাগরপারের ছাপ মারা এক ডাক্তারের।

বিপিনবাবু তখন পয়সা-কড়ি নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। বিপদে পড়েছিল একা বুঝি বিলাস। নিজের ব্যবসার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত তার মেলে নি।

কিন্তু খুঁজে বার করার দরুন বিপিনবাবুর আর কি ক্ষতি হয়েছে! বিলাস তাঁকে আরো ভাল করেই দাঁড় করিয়ে গেছে। এমন সময়ে তার এভাবে চলে যাওয়া হয়ত একটু বিস্ময়কর, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ! পৃথিবীতে অমন দুর্ব্বোধ ও নির্ব্বোধ লোক দু' একটা থাকে। তারা কি যে চায় হয়ত নিজেরাই জানে না ভালো করে।

কে জানে, হয়ত চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয়, আগুয়ান সহরের পথের মওড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের কোনদিন মনে হয়েছে, মানুষের দম্ভ মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে সন্ধি করে দিগ্বিজয়ে বেরুতে পারে।

তারপর আর একদিন মানপোতার মেলার রঙীন আলোয় তাদের ভুল ভাঙে কি? সে ভুল ভাঙার আঘাত তারা বুঝি সহ্য করতে পারে না। তারা ভেতরে ভেতরে দুর্ব্বল।

মেলার আলোগুলো যা করে হোক্ নিভিয়ে দিয়েও শান্তি পায় না। তাদের সরে যেতেই হয়।

কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তাদের অভাব কারুরই চোখে পড়ে না। তারা হয়ত সহরে থাকবার যোগ্য নয়। হয়ত কোথাও তারা টিঁকতে পারে না। তাদের ভেতরেই আছে গলদ। কেন, সুবোধবাবু ত বেশ আছেন, ক' বছরের বর্ষায় তাঁর বাড়ির গায়ে শ্যাওলার পুরু ছোপ ধরেছে। তাতে কি?

তাঁর বাড়ির পাশের রাস্তায় আবার রোলার ইঞ্জিন এসেছে। রাস্তা মেরামত হবে, বুঝি আরেকটু চওড়া হবে। তাঁর বাড়ির মর্য্যাদা তাতে কতখানি বাড়বে তিনি মনে মনে হিসেব করেন। এবার বালি-কাজটাও হয়ত তিনি ফেলে রাখবেন না।